ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

ভূমিকা

শ্রীশ্রী বাবামণি মহারাজের সাদর অনুরোধে আমরা অনেক আনন্দিত। উনি লিখিত লেখা শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপদেশ বাণী আমাদের নিকট বড় সেই নীর বচনামৃত। এর প্রতীক বিষয় তিনি বলিতেন যে তাঁহার সত্য সত্যই আছেন। অনেকের ভোগ নহে। তাঁর তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর [illegible] শিষ্যদের অনুভূতি এবং শ্রীশ্রী বাবামণি মহারাজের দেব দেবীর দর্শন এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট [illegible] [illegible] উপকৃত হইবে। [illegible] এ [illegible] অনেক [illegible] হইবে। শ্রীশ্রী বাবামণি মহারাজ অসীম আগ্রহে [illegible] [illegible] করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস তাঁহার এই [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও তাঁহাদের [illegible] [illegible] লাভ হইবে।

[illegible]

[illegible] ১৩৮১

স্বামী [illegible]

নিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহের অপূর্ব সমাধান-বাণী শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধু এবং ভক্তবৃন্দ জিজ্ঞাসু হইয়া অনেক সময় নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বা কথোপকথনচ্ছলে শ্রীশ্রীমহারাজ যে-সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা সাধু এবং ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাহার কতকাংশ সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইল। পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহারাজের কয়েকখানি উপদেশপূর্ণ পত্রও মুদ্রিত হইল।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবর্গের সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রারম্ভে তাঁহার লিখিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পাঠকবর্গের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইবে, সন্দেহ নাই।

মহালয়া, ১৩৪৩ প্রকাশক

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে—মানসপুত্র।' ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার যদি এ কথার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন—'রাখাল আমার ছেলে।'

যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'স্বামীজী' বলিতে যেমন শ্রীবিবেকানন্দকে, 'মহারাজ' বলিতে তেমন শ্রীব্রহ্মানন্দকে বুঝায়) অমিত-ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময়-পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন! সাধু, ভক্ত, ব্রহ্মচারী নির্মল চিত্ত লইয়া, অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এই সত্য অনুভব করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন! আত্মীয়স্বজন যাহার নাম শুনিতে

পরম প্রীত হইয়া একদিন তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে লইয়া আসিলেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত রাখালচন্দ্রের এই প্রথম মিলন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-সত্ত্বত্যাগী ভক্ত ছেলে আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে। একদিন দেখি, মা একটি ছেলে এনে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন—এইটি তোমার ছেলে। আমি তো শিউরে উঠলাম। মা আমার ভাব দেখে হেসে বললেন—সাধারণ সংসারিভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র। রাখাল আসতেই চিনতে পারলাম, এই সেই।"

রাখালচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ' বলিতে বলিতে মহা ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন ; অপারস্নেহময়ী জননীর যত্নে তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন। রাখালচন্দ্র তখন যৌবনোন্মুখ হইলেও স্বভাবে শিশু ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত শিশুবৎ ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু এই অপূর্ব বাৎসল্যের খেলা আনন্দমোহন প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন না। পুত্র শ্বশুরবাড়ি যায়, দুই-তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া আসে। প্রথম প্রথম আপত্তি ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সুযোগ পাইলেই পুত্র সাধুর কাছে পলাইয়া যায়। আনন্দমোহন বিষয়ী লোক ; বিষয় সংক্রান্ত নানা কাজে ঘুরিতে হয়, পুত্রকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতে পারেন না। বালককে আটক করিবার নিমিত্ত পিতা অবশেষে বাধ্য হইয়া ফাটকের নিয়ম অবলম্বন করিলেন। বাধা পাইয়া বালকের মন রুদ্ধ স্রোতের ন্যায় অধিকতর বেগবান হইয়া উঠিল।

এদিকে সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্রের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিয়া আকুল, "মা, আমার রাখালরাজকে এনে দে।" দৈবের আশ্চর্য বিধানে আনন্দমোহন এক কঠিন মকদ্দমায় লিপ্ত হইলেন।

কাগজপত্র দেখিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ উকিল-ব্যারিস্টার মত প্রকাশ করিলেন, জিতের কোন সম্ভাবনাই নাই। আনন্দমোহন তথাপি জিদ ছাড়িতে পারিলেন না, নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও মকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন—শত্রু তো উৎপীড়িত হইবে! আইনজীবী-দিগের সকল অনুমান ব্যর্থ করিয়া আনন্দমোহনের অতিমাত্র দুরাশা যাহা কল্পনা করিতে সঙ্কুচিত হইত তাহাই ঘটিল! হারের বাজি জিত হইল! মকদ্দমা-মামলায় সুদক্ষ আনন্দমোহন বুঝিলেন, এ অঘটন-ঘটনা নিশ্চিত দৈবকৃপা, পুত্রের সাধু সঙ্গের ফল। এখন হইতে রাখালচন্দ্রের সকল বাধা দূর হইল। পিতা তাঁহার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ অবাধ আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দমোহন ভাবিতে লাগিলেন, এ সাধু কে? দেখিবার জন্য স্বয়ং একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত! রাখালরাজকে সর্বদা কাছে পাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দমোহনকে সবিশেষ যত্ন করিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আহা! দেখ দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও; দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ঈশ্বরের নামজপ করে কি না! যদি বল, বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয়? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে তবু সে ছোলাগাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। তা রাখাল যে এখানকে আসে, তাতে কি আপনার অমত আছে?"

আনন্দমোহন দেখিলেন এখানে অনেক উকিল, কৌন্‌সিলী, হাকিমের সমাগম হয়, বিষয়-আশয় সম্বন্ধে সদ্‌যুক্তি করিবার বিস্তর সুবিধা; আর তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সে-সব সুযোগ-সংযোগ হইবার সম্ভাবনা; বলিলেন, "সে কি মশায়, রাখাল তো আপনারই ছেলে।

আপনার কাছেই থাক্, তবে মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য আমার ‑শানে পাঠিয়ে দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন লন।

পিতার অনুমতি পাইয়া রাখালচন্দ্র এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ ছাড়া হইতে চাহেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া-সুজাইয়া মাঝে মাঝে বাড়ি পাঠাইয়া দেন ; কিন্তু রাখাল চক্ষুর অন্তরাল হইলে হৃতশাবক বিহঙ্গমের ন্যায় ছটফট করিতে থাকেন। রাখালও গৃহে গিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না।

ইতোমধ্যে রাখালের শ্বশ্রূঠাকুরানী একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, সঙ্গে রাখালের বধূ—কন্যার সংসর্গে রাখালের ভগবদ্‌ভক্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে কি-না জানিবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বধূর লক্ষণসকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন কন্যা সুলক্ষণা, ঈশ্বরলাভে স্বামীর সহায়তা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে। বালিকাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া পাঠাইলেন, টাকা দিয়া পুত্র-বধূর মুখ দেখিতে।

এদিকে পিতাপুত্রে অপূর্ব প্রীতির খেলা চলিতে লাগিল। সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল-জ্ঞানে কখনো 'গোপাল', 'গোপাল' বলিয়া তাঁহার মুখে আহার তুলিয়া দেন, কখনো ব্রজের ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া নেন। অন্য কেহ কথা না শুনিলে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট শাসিত হয়, কিন্তু রাখাল অবাধ্য হইলে তাঁহার আনন্দ। আহারান্তে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ্ না, পান নেই যে।"

রাখালরাজ সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন, "পান সাজ্‌তে জানিনি।"

"সে কি রে! পান সাজ্‌বি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন।"

"পারবো না, মশায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তো হাসিয়াই আকুল। কিন্তু অন্য কেহ তাঁহার মানস-পুত্রকে সামান্য একটি ফরমাশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিতেন, "আহা, ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস্‌নি। ওর বড় কোমল স্বভাব।"

অথচ কল্যাণের জন্য এই কোমল স্বভাবকে আঘাত করিতে কখনই কুন্ঠিত হইতেন না। একদিন রাখালের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, এমন সময় কালীমন্দির থেকে প্রসাদী মাখন আসিল। বালক-স্বভাব ক্ষুদিত রাখালরাজ কাহাকে কিছু না বলিয়াই মাখনের ডেলাটি তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিলেন। পুত্রের আচরণ দেখিয়া পিতা তিরস্কার করিলেন, "তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভটোভগুলো ত্যাগ করবি, না, আপনি তুলে নিয়ে খেলি!" শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে মাখনের ডেলা রাখালরাজের গলায় বাধিল। তাঁহার বিবর্ণ গণ্ডযুগল দিয়া দরদর-ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দোষ দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালরাজকে স্বয়ং শাসন করিতেন, কিন্তু অন্য কেহ দোষের কথা তুলিলে বলিতেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়!"

শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিসীম আদরে রাখালরাজ ভাবিতেন—ইনি নিজস্ব আমার। তাঁহার প্রীতির ধনকে পাছে কেহ কাড়িয়া লয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ভক্তসমাগমে কখনো কখনো অভিমান ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কেহ অণুমাত্র অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে অসহ্য ক্রোধে রাখালরাজ অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্রাহ্মগৃহে এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ হয়। রাখালরাজ সঙ্গে ছিলেন। ভজনান্তে ভোজনের ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ আত্মীয়স্বজন লইয়া ব্যস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কই রে, কেউ ডাকে না যে!"

রাখাল মনে মনে এতক্ষণ উষ্ণ হইতেছিলেন। যথাসম্ভব ক্রোধ ও কণ্ঠ চাপিয়া বলিলেন, "চলে আসুন, মশায়, দক্ষিণেশ্বরে যাই!"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আরে রোস্! পয়সা নেই, খালি ফাঁকা রোখ! এতরাত্রে খাই কোথা, আর গাড়ি-ভাড়াই বা দেয় কে? রোখ করলেই হয় না।"

রাখাল তথাপি কহিলেন, "চলুন, মশায়, সেখানে যা হয় হবে এখন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি নুচি খেতে এসেছি, নুচি না খেয়ে যাব না।"

নিষ্ফল ক্রোধে রাখাল বসিয়া বসিয়া ফুলিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের ডাক পড়িল। আহারান্তে গাড়িতে আসিতে আসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তা নয় রে! তোরা সাধু ভক্ত, কিছু না খেয়ে গেলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। গৃহস্থের বাড়ি গেলে, কিছু না দেয়, এক গ্লাস জল কি একটা পান চেয়ে খেয়ে আসবি।"

এমন করিয়া দিন বহিতে লাগিল। দিনে দিনে রাখালরাজের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। অন্তরে ভক্তির পূর্ণ জোয়ার, অনুরাগের একটানা স্রোত—অনুক্ষণ যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন! জপ করিতে করিতে বালক বিড় বিড় করিয়া বকে! গুরুসেবার দিকে আর লক্ষ্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমায় জল দিতে হয়!"

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, রাখাল আর সংসারে আসক্ত হইবে না। কিন্তু তথাপি বলিতেন, "উহার ভোগের এখনো সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই, একটু বাকি আছে।" মাঝে মাঝে বাড়ি যাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেন। রাখাল বলিতেন, "সংসার আমার আলুনী লাগে। সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।" এইভাবে

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। শ্বশুরালয় হইতে নিমন্ত্রণ আসে, জামাতা প্রত্যাখ্যান করেন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিগণ শ্বশ্রূঠাকুরানীর কাছে একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জামাই কি শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?" ভক্তিমতী শ্বশ্রূ পরম আগ্রহে উত্তর দিলেন, "আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে?"

এদিকে রাখালের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, তিনি বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। প্রথম প্রথম শরীর সুস্থ বোধ হইল, বিভোর হইয়া বৃন্দাবন-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ব্রজের মাধুর্যময় সৌন্দর্যে ব্রজের রাখাল আজ যেন পূর্বস্মৃতির উদ্দীপনে চিত্তহারা! সেই যমুনা কৃষ্ণধ্যানে শ্যামাঙ্গিনী—শ্যামগুণগানে বিভোরা! ভৃঙ্গগুঞ্জনমোদিত সেই নিকুঞ্জ, নীল তমালপুঞ্জ অনিল-হিল্লোলে দুলিতেছে! প্রেমের পুলকে পাখি গাহিতেছে, শিখী নাচিতেছে! রাখালরাজ তাঁহার জনৈক গুরুভাইকে পত্র লিখিলেন, "এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন। ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ।" কিন্তু আবার তাঁহার অসুখ হইল—বৃন্দাবনের জ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের মহা ভাবনা হইল। তিনি বলিতেন, "রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান হইতে আসিয়া শরীরধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তাহার শরীর থাকে না।" অশ্রুধারে ভাসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীচণ্ডী-মায়ের নিকট আবেদন করিলেন, "মা, কি হবে? তাকে ভাল করে দে। সে যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে।" অন্যান্য ভক্তগণের নিকট রাখালের অসুখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ময়ূর-ময়ূরী এখন কেমন নাচ দেখাচ্ছে!"

কয়েক মাস পরে রাখালরাজ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে!" প্রাক্তনের ফলে রাখালের একটি পুত্র হইল।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে কালব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। ভক্তগণ প্রাণপণে গুরুসেবা করিতেছেন। রাখালরাজ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। অপর সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছে দেখিলে এখন আর তাঁহার মনে ঈর্ষা বা অভিমানের উদয় হয় না। বলিতেন, "মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু। উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন ?"

এদিকে ভক্তগণের সেবা ব্যর্থ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাখালরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

যাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া গুরুসেবায় রত হইয়াছিলেন, রাখালরাজ ভিন্ন প্রায় অপর সকলেই কুমার ব্রহ্মচারী। কিন্তু রাখালরাজের স্ত্রী-পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন বুঝেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে ; কিন্তু বুঝেছে, সব মিথ্যা, অনিত্য। ও আর সংসারে ফিরে যাবে না।"

তাহাই হইল। পিতার ঐশ্বর্য, রূপযৌবনশালিনী ভার্যা, সুকুমার কুমার, সংসারের যাহা কিছু মোহকর আকর্ষণ তৃণজ্ঞানে বর্জন করিয়া ব্রজের প্রেমিক রাখাল বিশ্বপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী মানসপুত্রের কথা মনে হইলে স্বতই জগৎপূজ্য শাক্যসিংহের স্মৃতি স্ফুরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর পুত্রকে গৃহে ফিরাইবার জন্য আনন্দমোহন পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিলে রাখালরাজ বলিয়াছিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন ? আমি বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।"

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে জীবনের আরাধ্য দেবতাকে হারাইয়া

রাখালরাজের হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শূন্য হৃদয় লইয়া তিনি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বাংলা ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত পুরীধামে গমন করিলেন। সেখানে কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া বরাহ-নগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মন নির্জন নর্মদাকূল লক্ষ্য করিয়া নিঃসঙ্গ তপশ্চরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রাখালরাজ আবার বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই কঠোর তপস্যার সূচনা। নিঃশব্দে সময়স্রোত বহিতেছে, একনিষ্ঠ তাপস ধ্যানমগ্ন। দিন রাত আসিতেছে, যাইতেছে ; ঋতুর পরিবর্তনে পৃথিবী কখনো কুসুমিত যৌবনে হাসিতেছে, কখনো অশ্রুধারে ভাসিতেছে, কখনো তুষার-ধবল বৈধব্যবেশ ধারণ করিতেছে। কিন্তু আমাদের তরুণ সন্ন্যাসীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। নিরন্তর জপ-ধ্যান-তপস্যায় জীবন-যাপন, কখনো মাধুকরী, কখনো আকাশবৃত্তি-অবলম্বন। কিছু জুটিল তো আহার, নইলে উপবাস ; কখনো বৃন্দাবন, কখনো হরিদ্বার, কখনো জ্বালামুখী—এইরূপে অদ্ভুত তপস্যায় বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল। এই সময় আবুপাহাড়ে হঠাৎ মহারাজের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইল। হরি মহারাজ তখন মহারাজের সঙ্গে থাকিতেন। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়-ধর্মের বার্তা লইয়া শিকাগো ধর্মমহাসভায় গমন করেন। মহারাজ তপস্যায় নিরত রহিলেন।

অতঃপর ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। মহারাজ উহার কার্য পরিচালনা করিতেন। ক্রমে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী কর্তৃক বেলড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, মহারাজ পরিচালন-সভার সভাপতি

হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" স্বামীজী মঠের সমস্ত ভার মহারাজের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "রাখাল, আজ হতে এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই!" মহারাজের উপর স্বামীজীর অটুট বিশ্বাস ছিল। মহারাজও স্বামীজীকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। স্বামীজী বলিতেন, "আমার সকল গুরুভাইরা আমায় পরিত্যাগ করলেও রাখাল ও হরিভাই আমায় কখনো পরিত্যাগ করবে না।" অন্যান্য গুরুভাইগণও মহারাজকে কি যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং ভালবাসিতেন তাহা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই অনুভব করিয়াছেন।

এদিকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী জগতে প্রচার করিলেন। তাঁহার সে আশার বাণী শ্রবণ করিয়া ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইল। অপরদিকে মহারাজ সে-সকল ভক্তগণকে লইয়া নীরবে, শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার অপরিসীম স্নেহ, ভালবাসা, অপূর্ব কর্মকুশলতা এবং আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হইয়া ভারত ও ভারতবহির্ভূত প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে অপূর্ব গুরুভাবের বিকাশ দেখা দিল। গুরুভাবের বিকশিত শতদল পদ্মের পুণ্য সৌরভে শত শত সাধুভক্ত তাঁহার চতুর্দিকে আসিয়া জুটিতে লাগিল। দৃষ্টিমাত্রে মহারাজ অধিকারী বুঝিয়া লইতেন এবং কাহারও বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া ভাবানুযায়ী শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহার প্রবল কর্মানুরাগ তাহাকে নিষ্কাম কর্মে, যাহার শাস্ত্রানুরাগ তাহাকে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যাহার ধ্যান জপ বা পূজার্চনায় অনুরাগ তাহাকে তাহাতেই উৎসাহিত করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত ছিল—নরেন ও রাখাল লোকশিক্ষার জন্য জন্মেছে। শ্রীগুরুর নির্দেশে 'লোকহিতায়' রাখালচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি কখনো হরিদ্বার, কখনো কাশী, কখনো বৃন্দাবন, কখনো মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া লোকল্যাণসাধন করিতে লাগিলেন। যখন যেখানে যাইতেন সেখানে লোকের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। আনন্দঘনমূর্তি ব্রহ্মানন্দের আগমনে তমঃ ও জড়তা দূর হইয়া সর্বত্রই আনন্দ ও চৈতন্য বিরাজ করিত। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানে সকলকে আনন্দস্রোতে ভাসাইয়া সকলকার প্রাণমন মাতাইয়া দিতেন। যাঁহারা মহারাজকে বেলুড়, হরিদ্বার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মহাসমারোহে ৺দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিতে অথবা রামনাম ও কালীকীর্তনের আসর জমাইয়া বিরাজ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিনের জন্য সে পুণ্যময় আনন্দস্মৃতি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধু ভক্ত পাপী তাপী সকলেই এই আনন্দময় পুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া নূতন ভাবে, নূতন উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। যাহারা একবার আসিত তাহারা রাখালরাজের পবিত্র প্রেম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ভুলিয়া যাইত। যে বিশ্বপ্রেম রাখালরাজ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন, যে প্রেম ব্রজের মূলধন, ব্রজের রাখাল আচণ্ডালে সে প্রেম অকাতরে বিলাইয়াছেন।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবক্ষেত্র গুপ্ত-বারাণসীতে মঠস্থাপনার উদ্দেশ্য—সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সাধন-ভজন করিবে। তিনি বলিতেন, "ছেলেরা সব সাধন-ভজন করবে, আমি দেখে আনন্দ করব।" যাহাতে সকলে সাধনার গভীর সলিলে মগ্ন হইয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মাধুর্যময় রসাস্বাদনে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্ত সদাই তাঁহার মন

ব্যাকুল হইত। মহারাজকে দেখিয়া মনে হইত তিনি সর্বদাই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন—হাসিতেছেন, খেলিতেছেন, কথা কহিতেছেন, কর্ম করিতেছেন ; কিন্তু মন সদাই অন্তর্মুখী, নির্বিকার, আসক্তিবিহীন, দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে, যেন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে, যা ইচ্ছে তা কর।" এ কথার যথার্থ তাৎপর্য মহারাজকে দেখিলে স্পষ্টতরভাবে অনুভব হইত। মঠ-মিশনের কার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ অহর্নিশ ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া মঠ ও মিশন পরিচালনা করিতে করিতে ২৪ মার্চ, ১৯২২, শুক্রবার, স্বামী ব্রহ্মানন্দ হঠাৎ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন। স্থির ধীর প্রশান্তভাবে রোগযন্ত্রণা অষ্টাহকাল ভোগ করিবার পর বহুমূত্ররোগের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় 'বলরাম-মন্দিরে' বাস করিতেছিলেন। ডাক্তার কবিরাজ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। ৮ এপ্রিল, শনিবার, রাত্রিতে সমবেত সাধু ব্রহ্মচারী ভক্তগণকে স্নেহভরে কাছে ডাকিয়া একে একে আশীর্বাদ করিলেন। সকলের মুখে হতাশার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ভয় পেও না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" তারপর গুরুভাইদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার মন সহসা এক অজানা রাজ্যে উধাও হইয়া গেল ; বলিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু। কৃষ্ণ এসেছে? আমাদের এ কৃষ্ণ—কষ্টের কৃষ্ণ নয়, এ গোপের কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখলাম গঙ্গার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম—তার উপরে বালগোপালমূর্তি সখা রাখালের হাত ধরে নৃত্য করছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনাবসান হইবে।" ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতাগণ বুঝিলেন সময় সন্নিকট।

কিছুক্ষণ পরে রাখালরাজ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি ব্রজের রাখাল, আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব।" দর্শন চলিতে লাগিল—পুনরায় বলিলেন, "এবারের খেলা শেষ হলো! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! আহা তোদের চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছিস নে—আমার কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি। ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর? দেখ দেখ! একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বলছে আয়!"

ব্রহ্মানন্দ পরক্ষণেই মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। ধ্যানে পরদিন অহোরাত্র কাটিল। তৎপর দিবস সোমবার, ১০ এপ্রিল রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় সেই মহাধ্যান মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া গেল। পরদিন নন্দনের পারিজাত চন্দনলিপ্ত করিয়া বেলুড় মঠে গঙ্গাকূলে অনলে আহুতি দেওয়া হইল।

সাধু বা সাধকজীবনের পুণ্যকাহিনী চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়। সেইজন্যই সে ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর-ভাবে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু রসাল ফল কি করিয়া সুপরিপক্ব হয়, তাহা অজানা থাকিলেও তাহার রসাস্বাদনে কোন বাধা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, "অত হিসাবে কাজ কি? তুমি আম খাও।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

স্থান—আলমবাজার মঠ

১ জুন, ১৮৯৭

প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুরের কথা কিছু বলুন। ঠাকুর সকলকে কি ভাবে দেখতেন?

উত্তর—তিনি সকলকে ভগবান-ভাবে দেখতেন। যখন স্বামীজী তাঁকে একদিন বলেন, "আপনি আমাদিগকে এত ভালবাসেন, শেষে কি আপনার জড়ভরতের মতো অবস্থা হবে নাকি?" তিনি তার উত্তরে বলেন, "জড়কে ভেবে জড়ভরত হয়ে থাকে, আমি যে চৈতন্যকে ভাবি রে! যেদিন তোদিগেতে মন আসবে, সেদিন সব দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

ঠাকুর একদিন কি কারণে স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলেননি, তাহাতে স্বামীজী কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য বোধ না করে অম্লানবদনে থাকায় তিনি বলেছিলেন, "এ মস্ত আধার।" আবার কেশব সেন একদিন স্বামীজীর খুব প্রশংসা করায় তিনি বলেন, "অত প্রশংসা করোনি, এখনো 'রাসফুল' খাবার ঢের দেরি।"

তিনি বলতেন, "ভগবানের জন্য কি রকম প্রেম চাই?—যেমন কুকুরের মাথায় ঘা হলে পাগলের মতো ছটফট করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ভগবানের জন্য সেইরূপ অবস্থা হওয়া চাই।"

ঠাকুর কাহাকেও দুই-তিন দিনের বেশি কাছে থাকতে দিতেন না। কোন যুবক তাঁর কাছে বহুদিন থাকায় অনেকে বিরক্ত হয় এবং তিনি ত্যাগধর্ম শেখান বলে অনুযোগ করে; তিনি তাতে বলেন, "ও সংসার করুক না, আমি কি নিষেধ করচি? কিন্তু আগে জ্ঞানলাভ করুক, তারপর সংসার করুক। আমি কি

সকলকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে উপদেশ দিই? যাদের দেখি একটু চেতিয়ে দিলেই হবে, তাদেরই বলি।" তিনি অপর সকলকে বলতেন, "তোরা আমড়ার অম্বল খেগে যা, অম্লশূল হলে তখন ওষুধ নিতে আসিস।"

ঠাকুর কখনো কখনো সকলকে জিজ্ঞাসা করতেন, "এ আমার কেমন স্বভাব বল তো? যারা আমাকে এক পয়সার বাতাসা দিতে পারে না, যাদের একখানা ছেঁড়া মাদুর বসতে দেবার সামর্থ্য নেই, তাদের কাছে এত যাই কেন?" পরে নিজেই আবার বুঝিয়ে বলতেন, "এদের দেখি যে সহজেই হবে; আর আর সকলের হওয়া বড় কঠিন—যেন দইয়ের হাঁড়ির মতো, দুধ রাখা চলে না।" তাঁদের তিনি বলতেন, "তোমাদের যাতে শীঘ্র শীঘ্র ভগবানলাভ হয় এজন্য প্রার্থনা করি।"

একদিন কর্তাভজাদের সম্বন্ধে কথা ওঠাতে গিরিশবাবু শ্লেষ প্রকাশ করে বলেন, তিনি উহাদের সম্বন্ধে একটা নাটক লিখবেন। গিরিশবাবুর এইরূপ কথা শুনে ঠাকুর গম্ভীর ভাব ধারণ করেন এবং বলেন, "দেখ, ইহাদের মধ্যেও অনেক সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছেন; এও একটা পথ।"

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বললেন, ঠাকুর শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সাংসারিক কার্যে আহারাদি করতে নিষেধ করতেন। ধ্যান করবার পূর্বে হরিনাম করতে বলতেন।

ঠাকুরকে একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন জিজ্ঞাসা করেন—কাম যায় কি করে? তখন তিনি বলেন, "যাবে কেন গো? ওটাকে অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দাও।" এইরূপ রাগ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলেন। এই কথা শুনে এঁর প্রাণ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

তিনি বলতেন, "যেখানে অত্যন্ত ব্যাকুলতা, সেইখানেই তাঁর অধিক প্রকাশ।"

তিনি কাউকে কাউকে বলতেন—(নিজেকে দেখিয়ে) "এখানকার প্রতি ভালবাসা রেখো, তাহলেই হবে।" সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে।

স্থান—আলমবাজার মঠ
২৩ জুলাই, ১৮৯৭

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বললেন—ঠাকুরের কথাবার্তা, বিশেষতঃ তাঁর সাধনভজন, আধ্যাত্মিক বিকাশ ও অনুভূতি প্রভৃতির বিষয় ঠিক ঠিক শুদ্ধভাবে অর্থাৎ তাঁর মুখ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখলে বড় ভাল হতো। তিনি যখন জ্ঞানের কথা বলতেন, তখন জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না। আবার ভক্তি বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলে কেবল ভক্তিরই কথা বলতেন, অন্য কিছু বলতেন না। তিনি বারংবার আমাদের মনে বিশেষ করে ধারণা করিয়ে দিয়েছেন যে, বৈষয়িক জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও বৃথা। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভক্তি ও অনুরাগের জন্যই সাধন করতে হবে।

প্রশ্ন—ঠাকুরের সমাধি কিরূপ হতো?

উত্তর—বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রকার সমাধিতে মগ্ন হতেন। কোন সময় তাঁর সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে যেত। এ অবস্থা থেকে নেমে এলে তাঁর সাধারণ ভাব অতি সহজেই আসত। আবার যখন তিনি গভীর সমাধিতে ডুবে যেতেন, তখন সমাধি থেকে নেমে আসবার পরই জলে-ডোবা মানুষ যেমন হাঁপিয়ে ওঠে সেইরূপ হাঁপিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস নিতেন। তারপর ক্রমশঃ তাঁর বাহ্যজ্ঞান আসত। ভাবসংবরণের পরও কিছুক্ষণ যেন

মাতালের মতো কথাবার্তা বলতেন, সব বুঝা যেত না। ঐ সময় কখনো কখনো ছোট ছোট সঙ্কল্প করতেন, ‘শুক্তো খাবো’, ‘তামাক খাবো’ ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো মুখের উপর দিয়ে হাতটা উপর থেকে নিচের দিকে টানতেন।

মহারাজ নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন—বাহ্যিক সহায়তা বিশেষ কিছু না পেলেও ঠাকুরের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ তোমরা কি মনে কর? একটু জন্মগত সংস্কার ছাড়া আর কিছুই বিশেষ দেখা যায় না। এ কি অলৌকিক ব্যাপার নয়? আরও অনেক অলৌকিক বিষয় আছে। একজন সাধু তাঁকে রামলালা নামে একটি ধাতু-মূর্তি দেন। তিনি সেই মূর্তিকে যখন গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে যেতেন তখন সেই মূর্তি গঙ্গায় সাঁতার কাটত! একথা তিনি নিজে বলেছেন। এ অবস্থায় তোমরা জড় আর চৈতন্যের বিভাগ কি করে করবে?

তিনি বলেছিলেন, প্রথম প্রথম তাঁর সাধু হবার বিশেষ কোনই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন একটা ঝড় বয়ে গেল, যাতে তাঁর সব ওলট্‌পালট্ হয়ে গেল।

প্রশ্ন—তাঁর কি কোন যোগ-বিভূতি ছিল?

উত্তর—অবশ্য অণিমাদি বিভূতি আমার নজরে কখনো পড়েনি, কিন্তু লোক-চরিত্র তিনি খুব বুঝতে পারতেন। আরও এই রকমের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আমি নিজে দেখেছি।

প্রশ্ন—কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপ কি যথার্থ আছে?

উত্তর—হ্যাঁ, আছে।

স্থান—বেলুড় মঠ

২৭ মে, ১৮৯৯

মহারাজ—তোমরা বক্তৃতা দিবার সময় যত পার পরমহংসদেবের উপদেশ বলবে। কারণ, তাঁর উপদেশের ভিতর দিয়ে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অতি সহজে বুঝা যায়।

পরমহংসদেব ভাবের ঘরে চুরি করতে বড় নিষেধ করতেন। সরল ভাবের লোককে তিনি বড় ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, আমি খোশামোদ ভালবাসি না। যে ভগবানকে প্রকৃতভাবে ডাকে তাকে আমি ভালবাসি। তিনি আরও বলতেন, সরলভাবে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে মনের সব দোষ দূর হয়ে যায়।

অনেকে ঠাকুরের নিকট গল্প করত যে, তাদের নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ভাব হচ্ছে। এই কথা শুনে কোন এক বালক এইরূপ কিছু করে দিতে ঠাকুরকে বিশেষ করে অনুরোধ করে। তাহাতে তিনি বলেন, "দ্যাখ, নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যানভজন করতে করতে তবে ও-অবস্থা আসে। ক্রমে ক্রমে সব হয়ে যাবে।" এই ঘটনার দুই-এক দিন বাদে ঠাকুর একদিন সন্ধ্যার সময় ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন দেখে সেই বালকও তাঁর পিছনে পিছনে গেল। ঠাকুর বরাবর ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। বালক মন্দিরের কাছে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস না পেয়ে সম্মুখে নাটমন্দিরে বসে ধ্যান করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সে দেখতে পেলে যে কোটি সূর্যের ন্যায় একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ গর্ভমন্দির থেকে বের হয়ে তার দিকে ছুটে আসচে। তখন সে ভয়ে নাটমন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের ঘরে পালিয়ে এল। ইহার অল্পক্ষণ পরে ঠাকুর ভবতারিণীর মন্দির হতে ফিরে এসে বালককে

তাঁর ঘরে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে বসেছিলি?" বালক উত্তর দিল, 'হ্যাঁ' এবং ধ্যান করতে বসে মন্দিরে জ্যোতিদর্শন ও ভয়ে পালিয়ে আসা ইত্যাদি ঘটনা আনুপূর্বিক ঠাকুরের নিকট বলল। এই সব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "তুই বলিস, কিছু দেখতে পাই না, ধ্যান করে কি হবে? আবার কিছু দেখতে পেলে পালিয়ে আসিস কেন?"

ঠাকুর রাত্রে এক আধ ঘণ্টার বেশি প্রায়ই ঘুমুতেন না। কখনো সমাধিতে, কখনো সঙ্কীর্তনে, আবার কখনো বা হরিনাম করতে করতে রাত কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো দেখেছি এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। সে অবস্থায় কথা বলবার চেষ্টা করেও কথা বলতে পারতেন না। সমাধি থেকে নেমে আসবার পর বলতেন, "দ্যাখ, ও-অবস্থায় মনে করি তোদের অনেক কথা বলব, কিন্তু তখন যেন আমার কথার ঘর বন্ধ হয়ে যায়।" সমাধির পর বিড়বিড় করে কি বলতেন। মনে হতো যেন কাহারও সঙ্গে কথা বলচেন। শুনেছি পূর্বে প্রায়ই সমাধি-অবস্থায় থাকতেন।

তিনি বলতেন, "ভগবানলাভ করতে হলে খুব অনুরাগ চাই।" যীশুখ্রীস্টের সেই গল্পটি মধ্যে মধ্যে বলতেন। জনৈক বৃদ্ধ যীশু-খ্রীস্টকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করে ভগবানলাভ করা যায়। যীশুখ্রীস্ট প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সেই বৃদ্ধকে নিকটস্থ কোন এক পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলে চুবিয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তখন যীশুখ্রীস্ট তাকে জল থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "জলের মধ্যে তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল?" উত্তরে বৃদ্ধ বললে, "দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় যায় মনে হচ্ছিল।" যীশুখ্রীস্ট তখন বললেন, "ভগবানের জন্য যখন মনের ঐ রূপ অবস্থা হবে তখনই তাঁকে লাভ করতে পারবে।"

স্বামীজী প্রথম প্রথম বড় শুষ্ক তর্ক করতেন, নিরাকারবাদী ছিলেন। এমনকি, ঠাকুরকেও বলতেন, "আপনি যে-সব দর্শন করেন তা সব মনের ভুল।" কেহ দেবদেবীর মন্দিরে প্রণাম করতে গেলে তাকে তিরস্কার করতেন। তাতে অনেকেই তাঁর উপর বিরক্ত হতো। ঠাকুর কিন্তু মোটেই বিরক্ত হতেন না। তিনি বলতেন, "নরেনের মতো আধার আজকালকার দিনে দেখতে পাওয়া যায় না।" পরে ঠাকুর যখন স্বামীজীকে দেবদেবীর রূপ দেখাইয়া দিলেন, তখন স্বামীজী সাকার মানতে আরম্ভ করলেন। তারপর থেকে বলতেন, "সাকার নিরাকার যাতেই হোক নিষ্ঠা থাকলেই সব হয়ে যাবে।"

স্থান—বেলুড় মঠ

২৫ এপ্রিল, ১৯১৩

প্রশ্ন—মন তো কিছুতেই স্থির হয় না।

উত্তর—প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ করবে। কোন দিন বাদ দেবে না। মন বালকের ন্যায় চঞ্চল, ক্রমাগত ছুটাছুটি করে। উহাকে পুনঃপুনঃ টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন করবে। এইরূপ দুই-তিন বৎসর করলেই দেখবে যে, প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ আসচে, মনও স্থির হচ্ছে। প্রথম প্রথম জপধ্যান নীরসই লাগে, কিন্তু ঔষধসেবনের মতো জোর করে মনকে ইষ্টের চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হয়, তবে ক্রমে আনন্দ আসে। লোকে পরীক্ষা পাস করতে কত খাটে, কিন্তু ভগবানলাভ তা অপেক্ষা অনেক সহজ। প্রশান্ত অন্তঃকরণে সরলভাবে তাঁকে ডাকতে হয়।

প্রশ্ন—ইহা অত্যন্ত আশার কথা যে, পরীক্ষা যখন পাস করতে পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে ভগবানলাভও কেন করতে পারব না। এক একবার অত্যন্ত নৈরাশ্য আসে—মনে হয়, এত জপ করেও যখন কিছু অনুভব করতে পাচ্ছি না, তখন বোধ হয় এ সব কিছুই নয়।

উত্তর—না না, নিরাশ হবার কোনই কারণ নেই। কর্মের ফল অনিবার্য। হেলায় হোক, আর খুব ভক্তির সহিতই হোক, নাম করলে তার ফল হবেই। কিছুকাল নিয়মিতরূপে সাধন কর। ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়, উহাতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

প্রথম প্রথম ধ্যান তো মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশি ধ্যানধারণা করে brainকে (মস্তিষ্ক) খুব exert করতে (বেশি খাটাতে) নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে, তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যানধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না; বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ refreshed (স্বচ্ছন্দ) হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

সাধনার প্রথম অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শরীরের সঙ্গে মনের খুবই নিকট সম্বন্ধ। খাওয়ার দোষে শরীর অসুস্থ হলে; ধ্যানধারণা করা অসম্ভব। সেইজন্যই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অত বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। এমন খাবার খেতে হবে যা সহজে হজম হয় অথচ পুষ্টিকর, উত্তেজক নয়। আবার বেশি খাওয়াও ভাল নয়, তাতে তমোগুণ বৃদ্ধি করে। খাদ্য-

দ্রব্য আধপেটা খাবে, জল একচতুর্থাংশ খাবে, বাকি একচতুর্থাংশ বায়ুচলাচলের জন্য খালি রাখবে।

ধ্যান করা কি সহজ কথা? একটু বেশি খেলে তো সেদিন আর মন বসল না। এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলি চেপেচুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান করা সম্ভব হয়। ওদের যে কোন একটি জোর করলেই ধ্যান হবে না। খুব তপস্যা চাই। দু-পয়সার ঘুঁটে কিনে জ্বালিয়ে আগুনের মধ্যে বসা তো খুব সোজা। কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলি দমন করে রাখা, ওদের express (প্রকাশ) হতে না দেওয়াই তো তপস্যা। নপুংসকের কি কর্ম? কাম-ক্রোধাদি রিপুদমনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মন স্থির হলে ধ্যান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনো ধ্যান করা হবে না। দুই-ই একসঙ্গে করতে হবে। মনের বাসনাদি সব কিছুই নয়, ধ্যানের সময় ভাববে—'সব অসৎ'। এইরূপ ভাবতে ভাবতে ক্রমে মনেতে সৎ ভাবের impression (সংস্কার) হবে। অসৎ ভাব মন থেকে যেমন তাড়াবে, সৎ ভাবও তেমনি আসতে থাকবে। ধ্যান করতে করতে অনেক সময় জ্যোতিদর্শন হয়, আবার কখনো কখনো প্রণব-ধ্বনি বা ঘণ্টা-ধ্বনি অথবা অন্য কোন দূরের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওসব কিছুই নয়। আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবে, ওসব লক্ষণ ভাল। ঐরূপ হলে বুঝতে হবে ঠিক ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি।

একটি লোক খুব ডানপিটে ছিল। মৃত্যুর পনর দিন আগে বলছে, "চল্ চল্, আমায় গঙ্গায় নিয়ে চল্। তোরা বুঝি ভেবেছিস আমি এখানে মরব?" গঙ্গায় গিয়ে একটু হেসে বললে, "মা, তুই ছিলি বলে আমি এত পাপ করেছি। জানি, তুই সব ধুয়ে পুঁছে

ফেলবি।" ভক্তি, বিশ্বাস-এর একটা থাকলেই ভগবানলাভ হয়।

স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) বলতেন, "কুলকুণ্ডলিনী একটু জাগা বড় ভয়ানক, ও উপরে না উঠলে কামক্রোধাদি নীচ বৃত্তিগুলি ভয়ানক প্রবল হয়। এইজন্য বৈষ্ণবদের মধুরভাব ও সখীভাবের সাধনা উচ্চ অধিকারী ভিন্ন বড় dangerous (বিপজ্জনক)। প্রথম প্রথম রাসলীলাবিষয়ক বইও পড়তে নেই।"

প্রশ্ন—মহারাজ, মন্ত্র নেবার কি দরকার? নিজে নিজে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেই তো হয়।

উত্তর—মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবানলাভ তো দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক গোলমাল হবে। ভগবানলাভ করতে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়, আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই?

যদি ভগবানলাভ করতে চাও তো ধৈর্য ধরে সাধন করে যাও। সময়ে সব হবে। তিনিই জানেন কখন তিনি দেখা দেবেন। হাঁকপাঁক করে কিছুই হয় না। সময় না হলে হাঁকপাঁকানিতে কোন ফল নেই। ঠাকুর বলতেন, "সময় না হলে পাখি ডিম ফুটোয় না।" এ-সময়কার মনের অবস্থা বড়ই

কষ্টদায়ক। একবার আশা, আবার নিরাশা—কখনো হাসি, কখনো কান্না—বস্তুলাভ না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন এই-ভাবে কেটে যায়। তবে তেমন গুরু হলে ও-অবস্থায় তাঁরা মনটাকে চট করে তুলে দিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ অসময়ে মনকে তুলে দিলে তার বেগ ধারণ করা যায় না, বরং শরীর ও মনের অনিষ্ট হয়। ও-অবস্থায় খুব সাবধানে চলতে হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থেকে তাঁর উপদেশানুযায়ী সাত্ত্বিক আহার, পূর্ণ-ব্রহ্মচর্যপালন ইত্যাদি নিয়মগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে না পারলে মাথা গরম, মাথা ঘোরা ইত্যাদি নানা রোগে ভুগতে হয়।

স্থান—বেলুড় মঠ
৩০ এপ্রিল, ১৯১৩

প্রশ্ন—মহারাজ, আমি ধ্যানজপ একসঙ্গে করতে আদিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ধ্যান তো একেবারেই হয় না, সেইজন্য মাঝে মাঝে মন বড়ই খারাপ হয়ে যায়।...

মহারাজ—মনে এইরূপ depression (নৈরাশ্য) আসা স্বাভাবিক। আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার এইরূপ হয়েছিল। আমার বয়স তখন কম, আর ঠাকুরের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ। কাজেই মনের সব কথা তাঁকে বলতে লজ্জা হতো। একদিন কালীঘরে ধ্যান করছি—কিছুই হচ্ছে না—মনটা ভারি খারাপ হলো; ভাবলুম—এতদিন এখানে আছি, কিছুই তো হলো না! কি নিয়েই বা থাকা যায়? দূর ছাই, ওঁকেও কিছু বলছি না, আর দু-তিন দিন এরূপভাবে থাকলে বাড়ি চলে যাব। সেখানে মন পাঁচটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এইসব ভেবে কালীঘর থেকে

বেরিয়ে আসছি—ঠাকুর তখন বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন—আমায় দেখে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের তখন নিয়ম ছিল, কালীঘর থেকে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জলটল খাওয়া। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন তিনি বললেন, "দ্যাখ, তুই যখন কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম, তোর মনটা যেন জালে ঢাকা রয়েছে।" আমি ভাবলুম, তাইতো, তিনি যে সব জেনেছেন। আমি বললুম, "আমার মন যে এরূপ খারাপ হয়েছে তা তো আপনি সব জেনেছেন।" তিনি তখন আমার জিভে কি একটা লিখে দিলেন, অমনি আমি আগেকার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর হয়ে গেলুম। তাঁর কাছে যখন ছিলুম তখন সর্বদা একটা আনন্দে ভরপুর থাকতুম। এইজন্যই তো সিদ্ধ এবং শক্তিশালী গুরুর দরকার।

মন্ত্র নিবার ও দিবার পূর্বে গুরুশিষ্যের অনেক দিন পরস্পরকে পরীক্ষা করা দরকার, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। এ তো দু-এক দিনের সম্পর্ক নয়। আমার কাছে কেহ মন্ত্র চাইলে আগে তাকে হাঁকিয়ে দিই। যদি দেখি ছাড়ে না, তখন বলি, এই 'নাম' এক বৎসর প্রত্যহ অন্ততঃ হাজার বার জপ কর, পরে দেখা করো। অনেকে এতেই ভেগে যায়।

* * *

একজনকে মন্ত্র দিতে কত খাটতে হয়। তার কোন্ দেবতা ইষ্ট, তাই পেতে অস্থির। একজনকে মন্ত্র দিতে আগে ভাবলুম, দেখি যদি ধ্যানে তার ইষ্ট পাই তবে তাকে মন্ত্র দিব, নচেৎ নয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধ্যানের পর এক মূর্তি দেখতে পেলুম, পরে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম ঐ মূর্তিই তার খুবভাল লাগে। আজকাল মন্ত্র নিয়ে অনেকেই কোন কাজ করে না, যাকে তাকে মন্ত্র দেওয়া ঠিক নয়।

খুব ধৈর্য চাই। ধৈর্য ধরে সাধন করে যাও, যতক্ষণ না বস্তু-লাভ হয়। খুব কাজ করে যাও। প্রথম প্রথম বেগার দেওয়ার মতোই লাগে—যেমন 'ক' 'খ' শিখবার সময়। তারপর ক্রমে শান্তি আসবে। আমাদের নিকট যারা মন্ত্র নিয়ে কেবলই complain (অভিযোগ) করে আর বলে, 'মহারাজ, কিছুই হচ্ছে না,' আমি দুই-তিন বৎসর তাদের কথা মোটেই শুনি না। তারপর তারা নিজেরাই এসে বলে, হাঁ মহারাজ, এখন কিছু কিছু হচ্ছে। এ ব্যস্ত হবার জিনিস নয়। দুই-তিন বৎসর খুব সাধন-ভজন করে যাও, তারপর আনন্দ পাবে। তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলুম। আজ-কাল অনেকেই ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চায়।

স্থান—বেলুড় মঠ

১০ মে, ১৯১৩

প্রশ্ন—মহারাজ, ভগবানে মতিগতি কিরূপে হয়?

উত্তর—সাধুসঙ্গ করতে করতে ভগবানে মতিগতি হবে। সাধুদের কাছে শুধু আনাগোনা করলেই হয় না। তাঁদের জীবন দেখে, তাঁদের উপদেশ শুনে, তদনুরূপ জীবন গড়তে হয়। ব্রহ্মচর্য ও সাধন-ভজন না থাকলে সাধুদের ভাব, তাঁদের উপদেশ কিছুই ধারণা হয় না; শাস্ত্রাদি পাঠ করে তার ঠিক ঠিক অর্থও বোঝা যায় না। 'কথামৃতাদি' বই খুব পড়বে এবং ধারণা করতে চেষ্টা করবে। যত পড়বে তত উহার নূতন নূতন অর্থ পাবে। সাধক ভগবানকে শুনে একরূপ বোঝে, সাধনা করে অন্যরূপ বোঝে, আবার সিদ্ধ হয়ে আর একরূপ বোঝে।

তাঁকে লাভ করতে হলে, তাঁর দর্শন পেতে হলে, খুব সাধন-ভজন চাই। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকতে হবে, তাঁর জন্য সব ছাড়তে হবে। কামিনী-কাঞ্চন ও মানযশের আকাঙ্ক্ষা এতটুকু

বেরিয়ে আসছি—ঠাকুর তখন বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন—আমায় দেখে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের তখন নিয়ম ছিল, কালীঘর থেকে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জলটল খাওয়া। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন তিনি বললেন, "দ্যাখ, তুই যখন কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম, তোর মনটা যেন জালে ঢাকা রয়েছে।" আমি ভাবলুম, তাইতো, তিনি যে সব জেনেছেন। আমি বললুম, "আমার মন যে এরূপ খারাপ হয়েছে তা তো আপনি সব জেনেছেন।" তিনি তখন আমার জিভে কি একটা লিখে দিলেন, অমনি আমি আগেকার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর হয়ে গেলুম। তাঁর কাছে যখন ছিলুম তখন সর্বদা একটা আনন্দে ভরপুর থাকতুম। এইজন্যই তো সিদ্ধ এবং শক্তিশালী গুরুর দরকার।

মন্ত্র নিবার ও দিবার পূর্বে গুরুশিষ্যের অনেক দিন পরস্পরকে পরীক্ষা করা দরকার, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। এ তো দু-এক দিনের সম্পর্ক নয়। আমার কাছে কেহ মন্ত্র চাইলে আগে তাকে হাঁকিয়ে দিই। যদি দেখি ছাড়ে না, তখন বলি, এই 'নাম' এক বৎসর প্রত্যহ অন্ততঃ হাজার বার জপ কর, পরে দেখা করো। অনেকে এতেই ভেগে যায়।

* * *

একজনকে মন্ত্র দিতে কত খাটতে হয়। তার কোন্ দেবতা ইষ্ট, তাই পেতে অস্থির। একজনকে মন্ত্র দিতে আগে ভাবলুম, দেখি যদি ধ্যানে তার ইষ্ট পাই তবে তাকে মন্ত্র দিব, নচেৎ নয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধ্যানের পর এক মূর্তি দেখতে পেলুম, পরে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম ঐ মূর্তিই তার খুবভাল লাগে। আজকাল মন্ত্র নিয়ে অনেকেই কোন কাজ করে না, যাকে তাকে মন্ত্র দেওয়া ঠিক নয়।

খুব ধৈর্য চাই। ধৈর্য ধরে সাধন করে যাও, যতক্ষণ না বস্তু-লাভ হয়। খুব কাজ করে যাও। প্রথম প্রথম বেগার দেওয়ার মতোই লাগে—যেমন 'ক' 'খ' শিখবার সময়। তারপর ক্রমে শান্তি আসবে। আমাদের নিকট যারা মন্ত্র নিয়ে কেবলই complain (অভিযোগ) করে আর বলে, 'মহারাজ, কিছুই হচ্ছে না,' আমি দুই-তিন বৎসর তাদের কথা মোটেই শুনি না। তারপর তারা নিজেরাই এসে বলে, হাঁ মহারাজ, এখন কিছু কিছু হচ্ছে। এ ব্যস্ত হবার জিনিস নয়। দুই-তিন বৎসর খুব সাধন-ভজন করে যাও, তারপর আনন্দ পাবে। তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলুম। আজ-কাল অনেকেই ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চায়।

স্থান—বেলুড় মঠ

১০ মে, ১৯১৩

প্রশ্ন—মহারাজ, ভগবানে মতিগতি কিরূপে হয়?

উত্তর—সাধুসঙ্গ করতে করতে ভগবানে মতিগতি হবে। সাধুদের কাছে শুধু আনাগোনা করলেই হয় না। তাঁদের জীবন দেখে, তাঁদের উপদেশ শুনে, তদনুরূপ জীবন গড়তে হয়। ব্রহ্মচর্য ও সাধন-ভজন না থাকলে সাধুদের ভাব, তাঁদের উপদেশ কিছুই ধারণা হয় না; শাস্ত্রাদি পাঠ করে তার ঠিক ঠিক অর্থও বোঝা যায় না। 'কথামৃতাদি' বই খুব পড়বে এবং ধারণা করতে চেষ্টা করবে। যত পড়বে তত উহার নূতন নূতন অর্থ পাবে। সাধক ভগবানকে শুনে একরূপ বোঝে, সাধনা করে অন্যরূপ বোঝে, আবার সিদ্ধ হয়ে আর একরূপ বোঝে।

তাঁকে লাভ করতে হলে, তাঁর দর্শন পেতে হলে, খুব সাধন-ভজন চাই। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকতে হবে, তাঁর জন্য সব ছাড়তে হবে। কামিনী-কাঞ্চন ও মানযশের আকাঙ্ক্ষা এতটুকু

থাকলেও হবে না। নাগ মহাশয় বলতেন, “নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে কি হবে ?” তাঁর আর একটি কথা—“প্রতিষ্ঠা লাভ করা সোজা, কিন্তু ত্যাগ করা কঠিন। যে ত্যাগ করতে পারে সে প্রকৃত সাধু।”

এমন দুর্লভ মানুষ-জন্ম পেয়ে ভগবানলাভের চেষ্টা না করলে বৃথাই জন্ম। শঙ্করাচার্য বলেছেন—

“মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।”

—মহাপুরুষ-সংশ্রয় অতি ভাগ্যবানেরই ঘটে।

প্রশ্ন—মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস সাধুদের কাছে গেলেই যথেষ্ট, আর কিছু শুনবার বা করবার দরকার হয় না।

উত্তর—ও কথা শোন কেন ? সাধুদের কাছে শুধু গেলেই হয় না। সরল প্রাণে তাঁদের নিকট প্রশ্ন করে মনের সন্দেহ ভঞ্জন করতে হবে, তাঁদের কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাঁদের উপদেশ শুনে তদনুরূপ জীবন গঠন করতে হবে। নিজে কিছু না করে শুধু সাধুদের কাছে গেলেই হবে, ও সব ফাঁকির কথা। তবে সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। তাঁদের দেখলে, তাঁদের কথা শুনলে, মনে ধর্মভাব ও সদ্ভাব জেগে ওঠে এবং সংশয় সব দূর হয়ে যায়। তাঁদের পবিত্র জীবন, ভাবময় জীবন দেখে মন যতটা impressed (প্রভাবিত) হয়, শত বই পড়লেও তা হয় না। অধর সেন প্রায়ই একজন স্কুল সব-ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসতেন। সেই সঙ্গীটির প্রায়ই ভাব হতো। একদিন ঠাকুরের নিকট আসার একটু পরেই ঠাকুর সমাধিস্থ হন। তাঁর মুখে এমন হাসি, যেন আনন্দ আর ধরে না। তখন অধরবাবু সেই সঙ্গীটিকে বলেছিলেন, “তোমাদের ভাব দেখে, ভাবের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়েছিল। কেন না তোমাদের ভাব দেখে বোধ হয় যেন ভিতরে কত যন্ত্রণা। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে ? এর ভিতরে

আনন্দ দেখে আমার চোখ ফুটল। এর ভাবও তোমাদেরই মতো দেখলে এখানে আর আসা হতো না।" ঠাকুরের কাছে না এলে, তাঁর এই 'ভাব' না দেখলে, অধরবাবুর মনের সংশয় কখনো যেত না। এই হলো সাধুসঙ্গের ফল। কিন্তু বস্তুলাভ করতে হলে খুব খাটতে হবে—খুব সাধন-ভজন করতে হবে। বুঝতে পারলে ?

প্রশ্ন—মহারাজ, সংসারে কি রকমে থাকতে হবে? নিষ্কামভাবে থাকাই তো উচিত ?

উত্তর—কি জান, নিষ্কাম-টিষ্কাম, ও খুব উঁচু কথা। সংসারে থেকে ওসব হয় না। লোকে যতই কেন ভাবুক না যে আমি নিষ্কামভাবে কাজ করছি, কিন্তু বাস্তবিক খতিয়ে দেখা যায় যে কোন না কোন কামনার তাড়নায় কাজ করছি। তা হলেই হলো যে নিষ্কাম কর্ম হয় না। তবে সংসারের কাজ করতে করতে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়—"প্রভু, আমার কাজ কমিয়ে দাও।"

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯ মে, ১৯১৩

প্রশ্ন—আপনি সেদিন বলেছিলেন যে হাঁকপাকানিতে কিছু হয় না।—সময় না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। তবে কি ভগবান-লাভের জন্য ব্যাকুলতা ছেড়ে দিতে হবে ?

উত্তর—ও হয়তো অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলুম। হাঁকপাকানি, মানে, দুই-একদিন emotion-এর (ভাবপ্রবণতার) বশে ছটফটানি, কান্নাকাটি ভিতরের ভাবের বহির্বিকাশ। উহা কিন্তু দুদিন বাদেই লোপ পায় এবং সে তখন নৈরাশ্য ও অবসাদে ওদিক একেবারেই ছেড়ে দেয়।

ভিতরের ভাব প্রকাশ করা বড়ই খারাপ। তাতে অনুরাগের intensity (তীব্রতা) কমে যায়। শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য রাধাবল্লভ গোস্বামী একদিন পূজা করতে করতে ভাবে অধীর হয়ে নৃত্য করছিলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁকে ত্যাগ করে বললেন, "তুমি নিজের স্বার্থের জন্য প্রভুর সেবার ত্রুটি করেছ।" শ্রীরাধা শ্রীরূপ গোস্বামীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিষ্যকে পুনরায় গ্রহণ করতে বলায় শ্রীরূপ গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি গোয়ালার মেয়ে, তুমি এর কি বুঝবে? শ্রীগুরুর কৃপায় আমি বুঝেছি কিরূপে শিষ্যকে শাসন করতে হয়।" শ্রীরাধার কথাও নিলেন না। এ ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের দোহাই দিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হলে চলবে না। তিনি শেষ বার বৎসর একেবারে উন্মত্তপ্রায় ছিলেন। তাঁর আনন্দ বা বিরহযন্ত্রণার কণামাত্রও জীব সহ্য করতে পারে না।...

প্রশ্ন—ঠাকুর বলতেন, একবার এখানে একবার ওখানে কুয়া খুঁড়তে গেলে কোথাও জল পাওয়া যায় না, এক জায়গায় লেগে থাকতে হয়। সাধনপথেও কি তাই?

উত্তর—হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম লেগে থাকতে হবে। ঠিক ঠিক অনুরাগ থেকে যদি ভগবানলাভের জন্য হাঁকপাঁকানি হয়, তবে তাতে ভগবানলাভ না হলেও সে ভুলে থাকতে পারে না। কোটি জন্মে না পেলেও অচল অটলভাবে তাঁকে ডাকতে থাকে। মানুষ ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে ডাকতে পারে না, কারণ তার ভিতরে দেনা-পাওনার ভাব রয়েছে; তাই একটু ডেকে তাঁকে না পেলেই হতাশ হয়ে পড়ে।

স্থান—বেলুড় মঠ

২৮ মে, ১৯১৩

প্রশ্ন—মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই। রামবাবুরও (রামচন্দ্র দত্ত) সেই মত ছিল।

উত্তর—তাঁর কথা আলাদা, তাঁর তেমন ঠিক ঠিক বিশ্বাসও ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ভাব রেখে সব ছেড়ে দিলেন। অপরে শুধু মুখে বলে, কিন্তু ঠিক ঠিক বিশ্বাস নেই।

প্রশ্ন—মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস—মাকে দেখেছি, সাধুসেবা করেছি, আমাদের আর ভাবনা কি ?

উত্তর—মাকে দেখলে আর সাধুসেবা করলেই হয় না। ধ্যান-ধারণা বিবেক-বৈরাগ্য চাই।

* * *

রামলাল দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আজ মঠে এসেছেন, ফিরে যাবার সময় মহারাজকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

রামলাল দাদা—মহারাজ, তাহলে আমি কামারপুকুরে যাব, না শিবুকে পাঠাব ?

উত্তর—কে জানে, দাদা, অপর কাউকে জিজ্ঞাসা কর। ওসব পরামর্শ-টরামর্শ এখন আমার আর আসে না। আমরা সাধুলোক, আমাদের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। চিরকাল জগৎটাকে মিথ্যা ভেবে ভেবে এখন ওসব বিষয়ে বড় একটা পরামর্শ দিতে পারি না, সব গুলিয়ে গেছে।

রামলাল দাদা—মহারাজ, আপনি যদি ওকথা বলেন তো আমরা যাই কোথা ?

উত্তর—মন বড় খারাপ হয়ে গেছে, দাদা। এখন একলা থাকি ভাল। লোকজন আর ভাল লাগে না। এখন ইচ্ছে হয় কাশী-টাশী অঞ্চলে গিয়ে থাকি। যাদের সঙ্গে মনের খুব মিল ছিল তারা সব একে একে চলে যাচ্ছে। শশীর কাছে ওবার ছ-মাস ছিলুম, কি সুখেই দিন কেটেছে! ঠাকুরের ভাব শশীর মতো এমন আর কেউ নিতে পারেনি। দক্ষিণে বেড়াতে এক হাজার টাকা খরচ করলে। First class-এ (প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে) বেড়ান, মুখে প্রতিবাদ করলুম, কিন্তু মনে মনে খুব খুশি হলুম। শশী টাকাকে পয়সার মতো জ্ঞান করত। সাধু এমনিই চাই। টাকাতে টাকা বোধ থাকবে না। এখন হরি মহারাজের কাছে থেকে সুখ হয়। তিনিও বাঁচবেন না, রোগে ধরেছে। ছেলেবেলা থেকে অটুট ব্রহ্মচর্য ছিল, healthও (স্বাস্থ্য) ভাল ছিল, তাই এখনো টেঁকে আছেন।

* * *

ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা করে যা না হয়, তখন তা আপনিই হতো। যদি মন কখনো একটু আধটু খারাপ হতো তিনি মুখ দেখেই টের পেতেন, আর বুকে হাত দিয়ে সব ঠিক করে দিতেন। তাঁর কাছে কত আবদারই না করতুম। একদিন তেল মাখাতে মাখাতে কি একটু বলেছিলেন, অমনি রেগে শিশি ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে চললুম। কিন্তু যদু মল্লিকের বাগানের কাছে গিয়ে আর যেতে পারলুম না—বসে পড়লুম। এদিকে ঠাকুর রামলাল দাদাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ডাকতে। ফিরে আসতে বললেন, "দেখলি, যেতে পারলি? গণ্ডি দিয়ে রেখেছিলুম।"

একদিন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, তার জন্য অনুতাপও হচ্ছে। কি করি, তাঁর কাছে বলতে গেলুম। যেতেই বললেন, গাড়ু

নিয়ে চল, পায়খানায় যাব। পায়খানা থেকে ফিরবার সময় নিজেই বলছেন, "তুই কাল অমুক অন্যায় কাজ করেছিস, অমন আর করিস নে।" আমি তো শুনেই অবাক! ভাবলুম, কি করে জানলেন!

আর একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে বলছেন—"কিরে, তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে—কিছু কু-কাজ করেছিস?" আমরা তখন জানতুম—চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ করলেই কু-কাজ হয়। বললুম—না। তিনি তখন বললেন, "তুই কি কোন মিছে কথা বলেছিস?" তখন মনে পড়ল—কাল হাসিঠাট্টা করতে করতে গল্পচ্ছলে একটা মিছে কথা বলেছিলুম।

* * *

স্থান—বেলুড় মঠ

১ জুন, ১৯১৩

প্রশ্ন—মহারাজ, ব্যাকুলতা কিসে হয়?

উত্তর—সৎসঙ্গ ও গুরুর উপদেশানুযায়ী সাধনভজন করতে করতে মন যখন শুদ্ধ হবে তখন ব্যাকুলতা আসবে।

কতিপয় ভক্তকে লক্ষ্য করে মহারাজ বললেন, "সাধুর কাছে এলে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর।"

প্রশ্ন—মহারাজ, শান্তি কিসে পাওয়া যায়?

উত্তর—ভগবানে প্রেম হলেই শান্তি হয়। ঠিক ঠিক শান্তি কি প্রথমেই হয়? তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হবে, তাঁকে পাচ্ছি না বলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে হবে, তারপর শান্তি। সংসারের ভোগ-সুখে লোকে যখন আর শান্তি পায় না, বিতৃষ্ণা বোধ করে, তখন

ভগবানের উপর টান হয়। অশান্তি যত বেশি হবে, শান্তি তত বেশি আসবে। পিপাসা যত বেশি হয়, জল তত বেশি মিষ্টি লাগে। সেইজন্য মহাপুরুষেরা বলেন—শান্তি পেতে হলে অশান্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন—প্রেম কিসে হয়?

উত্তর—তাঁর সাধন, ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদি দ্বারা প্রেম হয়।

প্রশ্ন—সংসারে থেকে হয় কি-না?

উত্তর—সংসারের বাইরে কি কেউ আছে?

প্রশ্ন—না, আমি বলছি, পরিবারের মধ্যে থেকে হয় কি-না?

উত্তর—হয়, তবে কষ্টে।

প্রশ্ন—সংসারে বৈরাগ্য হলে বেরুতে পারব কি-না?

উত্তর—বেরোন উচিত। এরই নাম বৈরাগ্য। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য একবার হলে জ্বলন্ত আগুনের মতো উহা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। ঠাকুর একটি উপমা দিতেন—পুকুরের মাছ বাইরে গেলে যেমন প্রাণ পায়, তেমন সংসার থেকে লোক বাইরে গেলে কি আর ফিরতে চায়?

প্রশ্ন—গুরু ছাড়া কি হয় না?

উত্তর—আমার বোধ হয়, না—কিছুতেই না। গুরু মানে যিনি ইষ্টের পথ, যেমন কোন নির্দিষ্ট নাম, ধরিয়ে দেন। গুরু এক, উপগুরু অনেক হতে পারে। সদ্‌গুরু বলেই দেন, এই এই সাধন কর, আর সৎসঙ্গ কর। পূর্বে নিয়ম ছিল—গুরুগৃহে বাস। গুরু শিষ্যের উপর নজর রাখতেন, শিষ্যও গুরুসেবা করত। শিষ্য বিপথে গেলে গুরু ফিরিয়ে আনতেন। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্ বা সিদ্ধ মহাপুরুষ ভিন্ন গুরু করা চলে না।

প্রশ্ন—কি করে সিদ্ধগুরু চেনা যায়?

উত্তর—কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকলেই চিনতে পারা যায়। গুরুও

শিষ্যকে দেখবেন। যদি তিনি বোঝেন যে, শিষ্যের প্রবল বিষয়ানুরাগ রয়েছে, তা থেকে সহজে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না, তাহলে তাকে মন্ত্র না দিয়ে ফিরিয়ে দেন। আর যদি বোঝেন, তার বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তাহলে তাকে কাছে কাছে রাখেন এবং সাধনার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে দেন। কুলগুরুর এক advantage (সুবিধা) এই যে, তাঁর সেই বংশের সব খবর জানা থাকে।

* * *

প্রশ্ন—মন কি করে একাগ্র হয়?

উত্তর—মন একাগ্র করবার উপায় হচ্ছে, সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। প্রাণায়ামও একটি উপায়, তবে সংসারের পক্ষে safe (নিরাপদ) নয়। ঐ সময় ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য রাখতে না পারলে ব্যারাম হয়। প্রাণায়ামকালে সাত্ত্বিক আহার, উত্তম স্থান, বিশুদ্ধ বায়ু, এসব চাই। ধ্যান-ধারণার কোন condition (বাঁধাবাঁধি) নেই। নির্জন স্থানে ধ্যান অভ্যাস করলেই হলো। রোজ দুই এক ঘণ্টা ধ্যানধারণা করলে তা নয়; যত বেশি করতে পারবে ততই মন একাগ্র হয়ে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে। নিত্য নিয়মিতভাবে করতে হবে। যেখানে যাবে ভাল ভাল স্থান, ভাল ভাল scenery (প্রাকৃতিক দৃশ্য) দেখলেই ধ্যানে বসে যাবে। তাঁকে খোঁজ। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে একমাত্র তাঁকেই অবলম্বন কর। তবে আগে ভিতরে ত্যাগ। এই সব অনিত্য বস্তু থেকে মন আগে তুলে নিলে বাইরের ত্যাগ আপনিই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—মহারাজ, বেদান্তের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' কথাটার মানে কি?

উত্তর—তার মানে হচ্ছে, জগৎটা আমরা যেমন দেখছি তা সব মিথ্যে। সমাধিতে জগৎ থাকে না, সুষুপ্তির পর মনে যেরূপ আনন্দ

থাকে নিরন্তর সেইরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঋষিরা যখন সমাধি থেকে নেমে আসেন, তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন—আনন্দ! আনন্দ! আর কিছু বলতে পারেন না। তখন 'আমি' 'তুমি' কিছুই থাকে না, থাকে কেবল সচ্চিদানন্দ। তিনি সাকার, নিরাকার, আবার তার পার।

প্রশ্ন—মহারাজ, ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি?

উত্তর—সাধুরা বলেছেন, "আমরা তাঁকে পেয়েছি, তোমরাও এইভাবে গেলে পাবে।" ঠাকুর বলতেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি আন, ঘোঁট, খাও, তারপর একটু অপেক্ষা কর, তবে নেশা হবে।" শুধু ভগবান ভগবান বললে হবে না। সাধন কর, তারপর তাঁর কৃপার জন্য অপেক্ষা কর, সময়ে তাঁর দর্শন পাবে।

প্রশ্ন—মহারাজ, জপ করতে করতে সময় সময় সব ভুল হয়ে যায়—ওটা কি?

উত্তর—পতঞ্জলি বলেছেন, 'ওটা বিঘ্ন।' ধ্যান মানে তাঁকে নিরন্তর ভাবা। উহা পাকলে, প্রত্যক্ষ হলে সমাধি। সমাধির পর আনন্দের জের অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলেন—আজীবন থাকে।

...চৈতন্যদেব একজন শিষ্যকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সে তাঁকে দেখে প্রথমে বিলাসী বলে মনে করেছিল কিন্তু ভগবানের নাম করতেই তাঁর ভিতর থেকে যেন প্রেমের ফোয়ারা উঠল। সাধু হলেই সাধুকে চিনতে পারে। সাধন করে উচ্চাবস্থা লাভ না হলে সে অবস্থার লোককে বুঝতে পারা যায় না। কথায় বলে, হীরের দাম বেগুনওয়ালা জানে না।

প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, "নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ভগবানকে ডাকবে, তা এক বৎসর হোক, তিন মাস

হোক, কি তিন দিন হোক।" সাধুসঙ্গ ও নির্জন সাধন—এর কোন্‌টিতে আমাদের বেশি stress (জোর) দেওয়া উচিত ?

উত্তর—দুই-ই করতে হবে। নির্জনে ধ্যান করতে বসলে মন সহজে অন্তর্মুখী হয়, বাজে চিন্তা কম আসে। একেবারে নির্জনবাস একটু না এগুলে পারা যায় না। অনেকে একেবারে নিঃসঙ্গ হতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। ঠিক ঠিক নিঃসঙ্গ মন সমাধিস্থ না হলে, ভগবানে লয় না হলে, হয় না।

সাধুসঙ্গও সর্বত্রই দরকার। একটি লোক ত্রৈলঙ্গস্বামীর নিকট গিয়েছিল। তাঁকে দেখে ভাবলে, ইনি কথা বলেন না, এঁর কাছে গিয়ে আর কি ফল ? এই ভেবে সেদিন ফিরে গেল। অন্য আর একদিন এসে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে রইল। সেদিন দেখলে, স্বামীজী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন, কতক্ষণ পরে আবার খুব হাসি। তাঁর এই ভাব দেখে সেই লোকটি তখন বলেছিলো, "আজ যা শিখলুম সহস্র পুস্তক পাঠেও তা হতো না। ভগবানের জন্য যখন এরূপ ব্যাকুলতা আসবে, তখনই তাঁর দর্শন পাব, এমনি আনন্দ লাভ করব।"

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৪

ঠাকুর বলতেন, "তিন টান এক হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিষয়ীর বিষয়ের ওপর—মায়ের সন্তানের ওপর, সতীর পতির ওপর, এই তিন টান যখন ভগবানে হবে, তখন তাঁকে পাওয়া যাবে।" এ কথাটার মানে কি ? যখন সব বাসনা মন থেকে উঠে গিয়ে ভগবানকে লাভ করবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগবে, তখনই তাঁকে

লাভ করা যাবে, তখনই তাঁর দর্শন-স্পর্শন লাভ করে আমরা ধন্য হব। গীতায় ভগবান বলছেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," যা কিছু সব ত্যাগ করে আমাকে (শ্রীভগবানকে) আশ্রয় কর। শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত—এ ছাড়া আর গতি নেই। কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু। অল্প সময়ের মধ্যে কাজ করতে হবে। সেই শক্তি-সামর্থ্য ত্যাগ-তপস্যা ও সাহস নেই, মন দুর্বল, কাজেই ভোগাসক্তি বেশি। তা সত্ত্বেও কিন্তু ভগবানকে পেতে হবে, তা না হলে এ জীবনটা বৃথা গেল, কেবল আসা-যাওয়া সার হলো। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া এ যুগে সহজ রাস্তা আর নেই।

* * *

শরণাগত বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের কিছু করতে হবে না—আমরা কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব? না, তা নয়। তাঁর কাছে সরল প্রাণে সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে, "হে প্রভু, আমি ভালমন্দ কিছু জানি না, আমি তোমার আশ্রিত, আমার যা অভাব তুমি তা পূরণ কর, যে রাস্তায় চললে আমার কল্যাণ হবে সে রাস্তায় নিয়ে চল, তোমার স্মরণ-মনন করার শক্তি দাও।"

শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা কি সোজা রে? মুখে অনেকে বলে আমি তাঁর শরণাগত—তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি। কিন্তু তার জীবনটা লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে, মুখে যেটি বলে ঠিক তার উলটোটি করছে। ভাল কাজ কিছু করলে ভগবানকে ভুলে গিয়ে 'আমি করছি' 'আমি করছি' বলে লাফালাফি করে। যেই কিছু বিপদ হলো অমনি ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপায়, আর বলে, তিনি আমায় কষ্ট দিচ্ছেন, দুঃখ দিচ্ছেন ইত্যাদি। অধিকাংশ লোকই এই ভাবে জীবন কাটায়।

আমরা বাইরের movement (চালচলন) দেখে লোক ভাল কি মন্দ বিচার করি ; কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী—তিনি মন দেখে বিচার করেন। সরল প্রাণে একটিবার ডাকলেই তিনি দৌড়ে আসেন। সরল হও, মন মুখ এক কর, তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।

ঠাকুর বলতেন, "আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর।" কত সহজ করে দিয়েছেন। এইটুকু বুঝে ধারণা করে নাও।···আমরা এত কুঁড়ে, এত ফাঁকিদার, নিজেকে ঠকাতে এত মজবুত যে, তৈরি রান্না জিনিস কেবল মুখে তুলে খাওয়া, তাও আমাদের দ্বারা হয়ে উঠছে না। আমাকে অনেকে বলে, আশীর্বাদ করুন, কৃপা করুন। শুনে আমার হাসি পায়। যা করতে বলব তা করবে না, সামনে থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের মতো যা ইচ্ছা করে, আর মনে করে নিজে একজন মস্ত সমঝদার। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যেমনটি বলেছিলুম করবার চেষ্টা করছ তো ? হয় বলে, সময় হয় না ; না হয় বলে, আমার মতো দুর্বল, পাপীর দ্বারা কি হয় ? যদি বিশ্বাসই নেই, কথাও মানবি নে, তাহলে যা ইচ্ছা কর না বাপু। কেবল ফাঁকি মারবার চেষ্টা। এই রকম লোক যারা আমার কাছে আসে তাদের নিয়ে আমি ঠাট্টা-তামাসা ও বাজে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিই। কেন মিছেমিছি বকে মরি। আর যারা দু-চার জন খাটবে-খুটবে ও কথা নেবে মনে হয়, তাদের সাধন-ভজনের কথা বলে দিই, তারাও ঠিক ঠিক ভাবে করবার চেষ্টা করে। ছেলেবেলা থেকে ফাঁকি দিতে দিতে এমন ফাঁকি দেওয়া স্বভাব হয়ে গেছে যে, সব জিনিসই ফাঁকি দিয়ে সারতে চায়।

তাঁর আশীর্বাদ, কৃপা কি কিছু কম আছে ? মানুষ মাথা পেতে নেবে না, চোখ চেয়ে দেখবে না। কেবল বাজে বক্ বক্ করবে। আসল জিনিস কে চায় ? বড় বড় কথা বলা ও বাজে বকাই মানুষের

স্বভাব। এই করেই জীবন কাটায়। ফলও তেমনি পায়। "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" উপদেশ করবার লোক অনেক পাওয়া যায়, উপদেশ শোনবার লোক কই? গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে মানুষ যদি খেটে চলে যায়, তবে তার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। তার কি আর এদিক সেদিক দৌড়ুতে হয়? ভগবানই তার অভাব মিটিয়ে দেন তাকে হাত ধরে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যান। তিনি যাকে কৃপা করেছেন তার আবার ভাবনা কি, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে always supply (সর্বদা যোগান) আসছে।

সদিচ্ছা, সদ্‌বাসনা, সদ্ভাব লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো একজনের হয়। এরূপ লক্ষের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। যাদের মনে সদ্ভাব জেগেছে, তাদের সকলের উচিত উঠে পড়ে লেগে যাতে ঐ ভাবটি বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টা করা। খেতে, শুতে, বসতে প্রার্থনা কর—"প্রভু, তোমার কৃপা বুঝবার ও ধারণা করবার সামর্থ্য আমায় দাও।"

ঠাকুর বেশ একটি গল্প বলতেন—বড়লোকের বাড়িতে ঝি থাকে। সে সর্বদাই মনিবের জিনিসকে 'আমার', 'আমার' করে, কিন্তু মনে মনে ঠিক জানে এসব কিছুই আমার নয়। সেই রকম আমাদের এই পৃথিবীতে যতদিন থাকতে হবে, অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু করতেই হবে, কিন্তু মনে ঠিক জানতে হবে, এ আমার ঠিক ঘর নয়, একটা বাসা মাত্র। শ্রীভগবানের পাদপদ্মই আমার আসল ঘর, যে কোন প্রকারেই হোক সেথায় আমাকে যেতে হবে।

সত্যকে আশ্রয় করতে, ভগবানকে আশ্রয় করতে কটা লোক চায়? সকলেই মনে করে, আমি যেটা বুঝি সেটা অভ্রান্ত, সেটটাই একমাত্র সকলের রাস্তা। অহঙ্কারে ভুলে মানুষ নিজেকে এত বড় আসনে বসায় যে, অনেক সময় ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করে না। কি বলে জান? যা বুঝতে পারিনে তা মানিনে। একবার ভেবেও

দেখে না যে, তার বুদ্ধির দৌড় কতটুকু। আজ যা ঠিক বলে ধরেছে, কাল তাকে ভুল বলে ছেড়ে দিচ্ছে, এই রকম রোজই মত change (বদল) করছে। সেই বুদ্ধির দৌড় দেখাতে গিয়ে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করে!

মহামায়া কত রকমে যে মানুষকে ভুলিয়ে রাখেন তা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু জানি, ভগবানের ভাবকে 'ইতি' করতে নেই। তিনি অনন্তভাবময়। তিনি মন ও বুদ্ধির অগোচর। তিনি যাকে দেখান, জানান, বোঝান, সে-ই তাঁকে দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে। তাঁকে জানলে, জ্ঞানের কপাট খুলে যায়, সকল গাঁট আল্‌গা হয়ে যায়। মানুষ যখন এই অবস্থা লাভ করে, তখন তার ঠিক ঠিক ধারণা হয় যে, আমি তাঁর—তিনি আমার।

মা রাশ ঠেলে না দিলে জ্ঞান কোথা থেকে পাবে? এই জগতের বা পরজগতের রহস্যভেদ তখনই হবে, যখন তিনি কৃপা করে সকল দরজা খুলে দেবেন। আমরা যাকে বুদ্ধি বলি, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়—তার area (সীমা) খুব limited (সঙ্কীর্ণ)। যাদের এ জীবনে আসল আনন্দ পাবার ইচ্ছা আছে এবং আমি কে, কি জন্য এখানে এসেছি, কেনই বা দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, কেনই বা মানুষ দেবত্ব ও পশুত্ব লাভ করছে ইত্যাদি জটিল সমস্যা মিটাতে উৎসুক তাদের একমাত্র কর্তব্য যে কোন রকমে ভগবানকে জানা। তাঁকে জানলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে, সকল প্রশ্নের 'ইতি' হয়ে যাবে।

ছেলেরা খুঁটি ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরে—তাতে বেশ মজা পায়। কিন্তু তাদের মন কোথায় থাকে জানিস? সেই খুঁটির দিকে। তারা ঠিক জানে খুঁটিটি ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে ও লাগবে। খুঁটিটিকে বেশ শক্ত করে ধরে যত ইচ্ছা পাক খাও না কেন, কোন ভয় নেই। সেই রকম আগে তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে জেনে খুঁটি জোর করে ধরে

নিতে হবে। খুঁটি জোর করে ধরে নিয়ে যা করবে সব ঠিক ঠিক হবে, কখনো বেচাল হবে না। তখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রভৃতির যে কোন রাস্তাতেই চল না কেন, নিজের ও দশের কল্যাণের স্বরূপ হবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।

স্থান—বেলুড় মঠ

ডিসেম্বর, ১৯১৫

মঠে এখন শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি রয়েছেন। কিছুদিন থেকে মহারাজ নিয়ম করেছেন, রাত্রি চারটার সময় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে সাড়ে চারটার মধ্যে সকল সাধু ব্রহ্মচারীকে ধ্যানজপ করতে বসতে হবে। ঘণ্টা দুই ধ্যানজপ করার পর, ঘণ্টাখানেক মহারাজের ঘরে বসে ভজন গান হতো। ছেলেদের সময়মতো জাগাবার জন্য মহারাজ নিজেই চারটার আগে উঠতেন এবং চারটা দশ মিনিটের সময় একজন সেবককে দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করতেন। কোন কোন দিন ভজনান্তে সাধন ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

মহারাজ—ইন্দ্রিয়ের কর্তা মনকে দমন করতে হবে। আবার মন বুদ্ধি উভয়কেই আত্মাতে লয় করতে হবে। মনকে একদম মেরে না ফেললে চলবে না। সাধুসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি চুপ মেরে আছে, মনে করো না ও-গুলি আর নেই। সমাধি না হলে ওসব যায় না। একটু ছেড়ে দাও, দেখবে দ্বিগুণ জোরে ইন্দ্রিয়গুলি ছোবল মারবে। সেইজন্য খুব সাবধানে থাকা প্রয়োজন, যতক্ষণ না মন-বুদ্ধির পারে যাচ্ছ।

ভগবান আছেন, ধর্ম আছে—এসব কথার কথা বা

morality (নীতি)-রক্ষার জন্য নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। Fanaticism (গোঁড়ামি) ভাল নয়। ধীর, স্থির, সংযমী হতে হবে।

চার বার ধ্যান করবি—সকালে, স্নানের পর, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। ভগবানলাভের জন্য ঘর দোর ছেড়ে এসেছিস, তাঁকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্যে 'হন্যে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা most miserable life (অত্যন্ত হীন জীবন)—না হলো এদিক না হবে ওদিক, এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেল। ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হবে। মন যদি তাঁতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় করে গীতা পাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি মন যখন নিচে নামে, একটু গীতা পাঠ করলে সেগুলো একেবারে যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকা—ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই? চাই যদি তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মতো কাজ করছিস কি না? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গলা টিপে ধরতে হবে, ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে—পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও মনের সূক্ষ্ম ফাঁকিগুলো ধরা পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে। "কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি। তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি।" এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের মিত্র। যে যত cross-examine (জেরা) করে মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত এই সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাবে।

খুব ধ্যানজপ করবি। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যানজপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই তো ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা—যেমন অমাবস্যা, একাদশীতে একাহার করা ভাল। বাজে গল্পটল্প না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে—সর্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভিতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্ব-প্রকাশ হবি।

এক একটা দিন বয়ে যাচ্ছে, কি করছিস? এ দিন আর ফিরে আসবে না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তিনি এখনো বর্তমান রয়েছেন। আন্তরিকভাবে ডাকলে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে ছাড়িস নে, তাহলে মরবি। 'তুমি আমার', 'আমি তোমার'—এই ভাব। এই পথে এসে যদি ধ্যানজপ না করিস, তাঁতে মন ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা না করিস, তাহলে ভারি কষ্ট পাবি, মন কেবল কাম-কাঞ্চনের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াবে। সত্ত্বের তম—যেমন এখনো আমার ভগবান লাভ হলো না, এ ছার জীবনে আর কাজ কি? এখনই আত্মহত্যা করব—এইরূপ ভাব ভাল।

হৃষীকেশের সাধুদের চালচলন মুক্ত পুরুষের মতন, কিন্তু বাস্তবিক তারা সেই stage-এ (অবস্থায়) পৌঁছায়নি। তারা হচ্ছে বিচারানন্দী।

স্থান—বেলুড় মঠ

ডিসেম্বর, ১৯১৫

মহারাজ—সাধারণ মানুষের মন তো নদীর স্রোতের মতো সদাই নিচের দিকে—কামিনী-কাঞ্চনের দিকে, মান-যশের দিকে ছুটেছে ; সেটাকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। মনের প্রবাহ সদা ভগবদভিমুখী করতে হবে। ঠাকুরের মন সদাই তুরীয় ভূমিতে থাকত, জোর করে জগতের দিকে মন নিয়ে আসতে হতো। পঞ্চবটিতে যখন সাধন করতেন, তখন সদাই তাঁর মন সেই ভূমিতে থাকত। যখন একটু নিচে নামত, তখনই যে তাঁর কাছে থাকত সে এক গরাস ভাত তাঁর মুখে গুজে দিত। এইরূপে সমস্ত দিনে হয়তো সাত আট গরাস ভাত জোর করে খাইয়ে দিত।

সদাই তাঁর স্মরণ-মনন করবে। স্মরণ-মনন সদা সর্বক্ষণ অভ্যাস হলে, তখন ধ্যান করতে বসলেই জমে যায়। ধ্যান যতই জমবে ততই ভিতরে আনন্দ। তখন কাম-কাঞ্চন ঠিক ঠিক আলুনী বোধ হবে। সেইজন্যই বাজে চিন্তা, বাজে কথা একেবারে ত্যাগ করতে হবে। বাজে চিন্তায় শক্তিক্ষয় হয়। উপনিষদে আছে, "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" কেবল আত্মধ্যান কর—এই হচ্ছে মোক্ষের উপায়। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, "শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান ; নগর ফের মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।" গীতাও বলেছেন, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। এই হচ্ছে ভগবানলাভের উপায়। ঠাকুর বলতেন, "মনের বাজে খরচ করতে নেই।" অর্থাৎ তাঁর স্মরণ-মনন করতে হবে। সংসারী লোক টাকা পয়সার বাজে খরচ যাতে না হয় তার জন্য কত হিসাব করে, কিন্তু মনের যে কত বাজে খরচ করছে তার দিকে হুঁশ নেই।

স্থান—বেলুড় মঠ

ডিসেম্বর, ১৯১৫

প্রশ্ন—ধ্যান জপ করতে বসলে এক এক দিন মন বেশ স্থির হয়, আবার এক এক দিন শত চেষ্টা করেও স্থির করতে পারি না, কেবল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায়।

উত্তর—ওরে, গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা আছে জানিস তো? সে রকম সব জিনিসেরই জোয়ার-ভাঁটা আছে জানবি। সাধন ভজনেরও জোয়ার-ভাঁটা আছে, তবে সেটা প্রথম প্রথম। ওর জন্য কিছু ভাবিসনি। লেগে পড়ে থাকতে হবে। কিছুকাল নিয়মিতরূপে সাধনভজন করতে পারলে, তখন আর জোয়ার-ভাঁটা খেলবে না, তখন একটানা গঙ্গা হয়ে যাবে।

আসনে বসেই অমনি ধ্যান জপ আরম্ভ করতে নেই। প্রথম বিচার করে মনকে বাইরে থেকে গুটিয়ে এনে, তারপর ধ্যান জপ আরম্ভ করতে হয়। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করতে করতে মন ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসবে।

যে সময়টা মন একটু স্থির হচ্ছে বুঝবি, তখন সব কাজ ফেলে দিয়ে ধ্যান জপ করবি। আর যখন ভাল লাগছে না, মন স্থির হচ্ছে না তখন নিয়মিত সময়ে আসনে বসে বিচারাদি সহায়ে মনকে স্থির করবার চেষ্টা করবি। একবারেই কি মন স্থির হয়? struggle, struggle, struggle (চেষ্টা, চেষ্টা, চেষ্টা)—প্রতি মুহূর্তে struggle করতে হবে। মন বলো, বুদ্ধি বলো, ইন্দ্রিয় বলো, struggle থাকলে সব control-এ (বশে) এসে যায়।

প্রশ্ন—মহারাজ, ঠাকুর এখনো আছেন?

উত্তর—তোর দেখছি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এই ভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তিনি সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য দিন রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি সব সংশয় দূর করে দিবেন, তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন—আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?

উত্তর—তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে অনুরাগ সে আকাঙ্ক্ষা কয়জনের আছে?

স্থান—বেলুড় মঠ

৭ জানুয়ারি, ১৯১৬

প্রশ্ন—একই পরিবারে, একইরূপে শিক্ষিত হয়ে একজন সাধু আর একজন দুষ্ট লোক হয় কেন? ইহা কি সংস্কার নয়?

মহারাজ—সবই free will-এ (স্বাধীন ইচ্ছায়) চলছে। সে ইচ্ছা করল আমি সাধু হবো। সেই ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে দৃঢ় করতে লাগল, তবে সাধু হলো। আবার একজন অন্য রকম free will করলে, কাজে কাজেই সে সেইরূপ হলো।

প্রশ্ন—আচ্ছা, মুরগীর বাচ্চা জলে নামে না, বাজপাখি দেখলেই ভয়ে পালায়, আর হাঁসের বাচ্চারা জলে নেমে সাঁতার দেয়। একি পূর্ব জন্মের সংস্কারে করছে না?

মহারাজ—তা কেমন করে বলব? যখন ডিম্বাকারে ছিল তখন কেন জলে পড়তে যায় না? ছোট ছোট বাচ্চারা সর্বপ্রথম তো

বাজপাখিকে ভয় পায় না। যখন তাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, তখন ভয় করতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেরা আগুনে হাত দিতে যায়, পরে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হলে যখন ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি আসে তখন আর তা করে না। দৈনন্দিন জীবনেই দেখুন না। আপনার অসুখ করল—শরীর প্রলয়ের দিকে যাচ্ছে ; আপনার ইচ্ছা বললে, ঔষধ দিয়ে রক্ষা কর। ফলে কিছুকাল শরীরের স্থিতি হলো। এইরূপ free will-এর দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় চলছে, বুঝেছেন কি না। সাধনভজন আর কি ? এই স্বাধীন ইচ্ছাকে বাড়ান। যার যত ইচ্ছাশক্তি বাড়বে, সে তত ভগবানের দিকে এগুবে। ঠাকুর বলতেন, "নিজের ভেতর শক্তি জাগিয়ে তুলবি।" ম্যাদাটে বৈরাগ্য, মর্কট বৈরাগ্যের কর্ম নয়। যার মন যত শুদ্ধ হতে থাকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ততই বাড়ে। দেখুন না, বুদ্ধদেব এক গাছতলায় বসে ইচ্ছা করলেন, এখানে হয় আমার শরীর শুকিয়ে যাক, নয় তো ভগবান লাভ হোক। ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল ছিল বলেই ভগবান লাভ হলো। এই রকম সর্বত্র। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলকারই নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। আমার এই জন্মেই ভগবান লাভ হবে। দেরি-টেরি, বা হচ্ছে হবে, ও সব নয়। আপনার ইচ্ছাশক্তিই তো আপনাকে চালাচ্ছে। আপনি ইচ্ছা করলেন শরীরটা এখান থেকে উঠে সেখানে গিয়ে বসুক, তবেই তা আপনি তাই করতে পারেন। যা কিছু করছেন তার আগেই তো ইচ্ছা বলছে অমুক কর, তমুক কর। একটা শব পড়ে রয়েছে, তার ইন্দ্রিয় প্রকৃতি সব আছে, চেয়েও রয়েছে। তবে কেন সে উঠতে বা যেতে পারছে না ? এর বেলা কি বলবেন বলুন ?

উত্তর—তার চৈতন্য নেই বলেই হচ্ছে না।

মহারাজ—ও একটা কথা বলে দিলেন মাত্র। চৈতন্য মানে কি বুঝেন, বলুন দেখি ? ব্যাখ্যা করে বলুন।

উত্তর—Electricity (বিদ্যুৎ) চলে গেছে।

মহারাজ—বিদ্যুৎ দিয়ে কোন শব কেউ বাঁচাক দেখি।

উত্তর—এমন রোগী দেখেছি যার হাত পা এলিয়ে গেছে, মরণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিন্তু বিদ্যুৎ দিয়ে কয়েক ঘণ্টা বাঁচান গেল।

মহারাজ—সে তাহলে সম্পূর্ণ মরেনি, গোটাকতক মৃত্যুচিহ্ন দেখা দিয়েছিল মাত্র ; তাই আপনি তাকে বিদ্যুৎ দিয়ে একটুখানি চেতন করতে পারলেন। কিন্তু যে একেবারে মরে কাঠ হয়ে গেছে তাকে কি করবেন ?

উত্তর—না, তা হয় না।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসে ?

মহারাজ—সে আলাদা প্রশ্ন ও অনেক কথা। শবের ভিতর free will (স্বাধীন ইচ্ছা) নেই। ইচ্ছা করতে পারে না, তাই নড়তে চড়তে পারে না। আজ এ পর্যন্ত থাক। কাল আবার আপনার পক্ষ আমি নেব এবং বুঝিয়ে দেব সংস্কার ও ইচ্ছাশক্তি কিছুই নেই।

আপনাকে একটা কথা খুব আন্তরিকভাবে বলে রাখছি। এখন না বুঝতে পারেন, সময় হলে বুঝবেন কিন্তু মনে করে রাখবেন। কথাটা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন ও বুদ্ধি তাকে ভালর দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মন্দ হতে দেয় না। কারুকে কাঁটা বন দিয়ে, কারুকে সোজাসুজি, কারুকে আবার অন্য প্রকারে। এই রকম একটা সাধনই আছে—মনকে ছেড়ে দাও, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক, তার যা খুশি করুক। এইরূপে ছেড়ে দিলে দেখতে পাবেন প্রথম

প্রথম খারাপের ভিতর দিয়ে গেলেও শেষে ভালর দিকে যাবে। এটা ভুলবেন না, মনে রাখবেন। (কিছুক্ষণ থামিয়া) ভগবানের কথা বলতে যাওয়াই আমাদের ধৃষ্টতা। বাক্য ও মনের ভিতর দিয়ে বললে তাঁকে ছোট করা হয়। মহিম্নস্তোত্রে এক জায়গায় আছে—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।"

সমুদ্র যদি দোয়াত, হিমালয় যদি কালি, কল্পতরু শাখা যদি কলম ও পৃথিবী যদি কাগজ হয়, তবু তোমার কথা লিখে শেষ করা যায় না। কাশীপুরের বাগানে লীলা-সংবরণের কিছু আগে ঠাকুর অনন্তের কি সব idea (ধারণা) দিতেন! একদিন আমি, গিরিশবাবু, স্বামীজী, শশী ও নিরঞ্জন আছি। আমরা তখন ছেলেমানুষ। গিরিশবাবু আমাদের মধ্যে তখন প্রবীণ, আর অত মেধাবী তো! ঠাকুরের মুখে অনন্তের সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনেই বললেন—আর না, আর ধারণা হচ্ছে না। উঃ! কি সব কথা! বলতেন, শুকদেব ডেও পিঁপড়ে, একদানা পেলেই বিভোর। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সচ্চিদানন্দ-গাছে থোলো থোলো ফলছে। এই সব অনন্তের ভাব। আমরা তখন ছেলেমানুষ, অত ধারণা করতে পারব কেন? থাক, আজ এই অবধি।

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৬

সাধনভজন একটা নিয়ম করে করতে হয়। নিষ্ঠা একটা মস্ত জিনিস, নিষ্ঠা না থাকলে কোন কাজে successful (কৃতকার্য)

হওয়া যায় না। নিষ্ঠা এমন চাই যে, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন আমাকে আমার নিয়ম পালন করতেই হবে। সকল বিষয়ে একটা নিয়ম করে নিবি। এত সময় ধ্যান করব, এত সংখ্যা জপ করব, এত সময় পড়ব, এত সময় ঘুমুব ইত্যাদি। Irregular life (অনিয়মিত জীবন) হলে কোন কাজে successful (কৃতকার্য) হওয়া যায় না। Regulated life (নিয়ন্ত্রিত জীবন) শারীরিক ও মানসিক development (বিকাশ)-এর একমাত্র উপায়। ঘড়ি যখন ঠিক না চলে তখন তাকে regulate (নিয়মিত) করে নিতে হয়। Regulate করলে তখন আবার ঠিক time (সময়) দেয়। মানুষের মনও সেই রকম। নানা কারণে irregular (এলোমেলো) হয়ে যায়, সাধুসঙ্গে তাকে আবার regulate করে নিয়ে চালাতে হবে। সাধু মহাপুরুষদের উপদেশমত জীবন চালিয়ে নেবার চেষ্টা করলে অনেক বাধাবিঘ্নের হাত থেকে এড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। তাঁদের উপদেশমত চললে তাঁরা যে বস্তুর অধিকারী হয়েছেন, সেই বস্তুর অধিকারী হয়ে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

তাঁতে মন জমাতে না পারলে, এ জগতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত। মহামায়া কত খেলাই না খেলেন! তার ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্ত হয়ে যেতে হয়। কাম, ক্রোধ, মোহাদি দুর্জয় রিপুর সঙ্গে সদা সর্বদা লড়াই করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কি মুখের কথা, না হাসি তামাসার কথা? তাঁর বলে বলীয়ান না হলে, কারও সাধ্য নেই মায়ার এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে। তাই তোদের বলি, আগে তাঁর বলে বলীয়ান হ।

যতদিন মন control-এ (বসে) না আসে, ততদিন নিয়ম বিশেষ দরকার। নিয়ম না থাকলে মন কিছুতেই কিছু করতে দেবে না, সদাসর্বদাই ফাঁকির মতলব দেবে। একটা নিয়মের উপর চললে

মনকে জোর করে বলা চলে—মন, তুই এই নিয়মের অধীন, তোর ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, তোকে এই নিয়ম মানতেই হবে। এই রকমে মনকে জোর করে বশে আনতে হবে। মন বশে এলে, সব নিয়ম তখন আপনা থেকেই খসে যাবে।

নদীর স্রোতের মতো জীবন কেটে যাচ্ছে। যে দিনটা গেল সে আর ফিরবে না। সময়ের সদ্ব্যবহার কর, শেষে হায় হায় করলে কোন ফলই হবে না। উঠে পড়ে লাগ। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।" মরতে তো হবেই, দুদিন আগে আর পরে। ভগবানের জন্য যদি জীবনটা যায় তো লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। রোখ করে মনকে বল—বস্তুলাভ করবই করব। এ দুনিয়াকে তুচ্ছ করে দে, এখানে কি সুখ আছে? কেবল দুঃখকষ্ট। দুঃখকষ্টের পারে চলে যেতে হবে। তাঁর আভাস পেলে, দেহসুখ তুচ্ছ হয়ে যায়। সে সুখ অনন্ত। ঠাকুরের এখানে যখন এসে পড়েছিস, তখন আর ভাবনা কি? দুনিয়ার সব জিনিস ঠেলে ফেলে দিয়ে, তাঁকে নিয়ে পড়ে থাক।

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৬

সাধনভজনে মন যখন একবার বসে যাবে তখন দেখবে কি আনন্দ! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কোথা দিয়ে কেটে যাবে।

নিজের ভাব বেশি লোকের কাছে বলা ঠিক নয়, বিশেষ যারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তাতে ভাবের হানি হয়। যাদের সঙ্গে ভাবের মিল আছে, তাদের সঙ্গে সাধনভজন সম্বন্ধে কথাবার্তা কইলে অনেক উপকার হয়। সকলেই এক পথের যাত্রী, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে

পারে। একজন যে রাস্তা দিয়ে চলেছে, সে রাস্তায় আপদ বিপদ কি আছে, হয়তো তার তা জানা আছে। তার কাছ থেকে সে সব বিষয় জেনে নিলে আপদ বিপদের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। যেমন ভাল guide (পথ-প্রদর্শক) সঙ্গে থাকলে রাস্তায় যে সব দেখবার শোনবার জিনিস আছে, সে সব দেখা-শোনাও হয়, আবার কোন আপদ বিপদেও পড়তে হয় না—অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারতে পারা যায়, আর তাড়াতাড়ি ঠিকানায়ও পৌঁছান যায়। মানুষের বুদ্ধির দৌড় কতটুকু? এইজন্য একজন ভাল guide-এর (উপদেষ্টার) সঙ্গে থাকা দরকার। জীবন অল্প, কাজ করতে হবে অনেক। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে লক্ষ্যে পৌঁছান যায় তার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

এই জীবনের কিছু ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো করে পথের সম্বল করে নিয়ে বসে থাক। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছান থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

সদ্‌বাসনা মনে যখন জেগেছে, সদ্ভাবে জীবনযাপন করবার, তাঁকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটেখুটে বস্তুলাভ করে নাও। খুঁটি পাকড়াও। শরীর যাক আর থাক, খুঁটি পাকড়ান চাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ আমি সব করতে পারি, এইরকম বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও—বস্তু

পাবে, মনুষ্য-জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে। আসা-যাওয়া বড় কষ্ট। আসা-যাওয়ার দফা শেষ করে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

ভয় ও দুর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন কখনো খারাপ করবে না। যত বড় পাপই হউক না কেন লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের দিক দিয়া উহা কিছুই না। তাঁর এক কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে। লোককে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য পাপের অত গুরুতর শাস্তির কথা লেখা আছে। তবে কর্মের ফল আছেই। অন্যায় কাজ করলে তজ্জন্য মনে অশান্তি আসে।

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৬

সাধনভজন-সম্বন্ধে সকলের এক নিয়ম খাটে না। কার কোন্ দিকে tendency (মতিগতি) আগে ভাল করে দেখতে হয়। কাকেও তার ভাবের বিরোধী উপদেশ দিলে তার কোনই উপকার হয় না বরং অপকারই হয়। এইজন্য কার কোন্ দিকে tendency সেটা ভাল করে দেখে, কিরকম ভাবে বললে কথাটা সে সহজে নিতে পারবে সেটা বিশেষ করে বুঝে, তবে কাউকে কিছু বলা উচিত।

সাধনভজন-সম্বন্ধে general (সাধারণ) ভাবে দু-একটা কথা ছাড়া সকলের সামনে ব্যক্তিবিশেষকে কিছু বলা চলে না। ঠাকুরকেও দেখেছি তিনি প্রত্যেককে আলাদা ডেকে, অধিকারী বিশেষে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। সাধনভজন-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে হলে একান্তে প্রশ্ন করা উচিত। মোটামুটি এই কয়েকটি বিষয় সকলের জানা ভাল।

প্রথম—ভগবানে বিশ্বাস চাই। এইটি মনে ঠিক করে নিতে হবে যে, তাঁকে লাভ করলে, তাঁর কৃপা পেলে, আমার জীবনের সব question (সংশয়) solved (মীমাংসা) হয়ে যাবে, আমার যে জন্য পৃথিবীতে আসা তা সার্থক হয়ে যাবে, আমি অমৃতের আস্বাদ পেয়ে অমর হয়ে যাব।

দ্বিতীয়—ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য ছাড়া কোন বড় ভাবের ধারণা হয় না। শরীর, মন ও brain (মস্তিষ্ক)-কে পুষ্ট করতে হলে, তাদের full development (পুর্ণ বিকাশ) করতে হলে, ব্রহ্মচর্য চাই। ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ ব্যক্তির একটা special (বিশেষ) নাড়ী হয়, যার জন্য তার স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি অদ্ভুত রকমে বেড়ে যায়। আমাদের আচার্যেরা ব্রহ্মচর্যের উপর কেন এত জোর দিয়েছেন? তাঁরা জানতেন, ঐ জায়গাটা ঠিক না থাকলে সব গেল। ব্রহ্মচারীর শরীরে waste (ক্ষয়) নেই। কাজেই সে বাইরে পালোয়ান নাও হতে পারে, কিন্তু দিন দিন তার brain-এর (মস্তিষ্কের) 'fertility (উর্বরতা) এত বেড়ে যায় যে, সহজেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের তত্ত্ব ধারণা করবার সামর্থ্য হয়।

তৃতীয়—জিহ্বার সংযম। জিভ অনেক অনর্থ করে। ঠাকুর বলতেন—"ভুঁড়ি ও মুড়ি ঠাণ্ডা রাখ।" অর্থাৎ পেট ও মাথা ঠাণ্ডা রাখলে অনেক কাজ করা যায়। বেশি বাজে বকলে মাথা গরম হয়। মাথা গরম হলে ধ্যান-ধারণা করা যায় না, চিত্ত চঞ্চল হয়, ঘুম হয় না, নানা অনর্থ হয়। সেই রকম যে লোভী, খাওয়া-দাওয়ায় যার সংযম নেই, সেও নিজের শারীরিক বা মানসিক অনর্থ করে। হয়তো ভাল খাবার পেয়ে কতকগুলো খেলে, তারপর হাঁসফাঁস করতে থাকে। যত energy (শক্তি) ঐ খাবার হজম করতেই যায় বা হজম করতে না পেরে অসুখ হলো। কিংবা পেঁয়াজ, রসুন কতকগুলো

উত্তেজক খাবার খেয়ে শরীর ও মনকে এমন excited (উত্তেজিত) করে দিলে যে, তার জের সামলাতে অনেক বেগ পেতে হলো। আমার মনে হয়, যারা সাধনভজন করতে চায় তাদের খাওয়াদাওয়া-সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। গুরুভোজন কখনো করবে না। পুষ্টিকর অথচ সহজে হজম হয় এবং উত্তেজক নয় এমন জিনিস খেতে হবে। উত্তেজক জিনিস খাওয়া যেমন খারাপ, তেমন আবার কতকগুলো জিনিস আঁছে যাতে তমোগুণ বৃদ্ধি করে, সেসব জিনিসও বাদ দিতে হবে। খাওয়ার দরকার কেন? শরীর ভাল থাকবে বলে। ভগবানের স্মরণ-মনন করবার জন্য শরীর ভাল রাখা চাই। "শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" শরীর ভাল রাখতে হবে। তার মানে এই নয় যে, দিনরাত শরীরের উপর মন ফেলে রাখা।

ঠাকুর বলতেন, "দিনে বারুদ-ঠাসা খা, রাতে কম খাবি।" দিনের বেলা পেট ভর্তি খাও, হজম হবে। রাতে কম করে খেয়ে শরীরটা বেশ হাল্‌কা থাকবে, ধ্যান-ভজনের বেশ সুবিধা হবে। রাতে ভরপেট খেলে আলস্য বাড়িয়ে দেয়, আর কেবল ঘুমোবার ইচ্ছে হয়। রাতে ঘুমিয়ে কাটাবি, না ভজন করবি? দিনের বেলা নানারকম গোলমাল থাকে, মনকে একটু স্থির করতে গেলে নানা-রকম গোলমাল এসে চঞ্চল করে দেয়। রাত্রে প্রকৃতি বেশ শান্ত ভাব ধারণ করে, জীবজন্তু সব অসাড়ে ঘুমোয়—সাধনার পক্ষে এই উপযুক্ত সময়। গভীর রাত্রে ধ্যান জপ অল্পেতেই জমে যায়।

সাধনভজন ঢাক পিটে করবার জিনিস নয়—তাতে অনিষ্ট হয়। নানা লোকে নানা কথা বলে ঠাট্টা করে। আবার এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক নয়, এই সব বলে নানা ভাবে উপদেশ দিয়ে মনকে সন্দিগ্ধ ও চঞ্চল করে তোলে এবং সাধনার বিঘ্ন করে। ঠিকঠিক

সাধক কি রকম জানিস ? মশারির ভিতর শুয়েছে, সকলে মনে করে ঘুমুচ্ছে, সে কিন্তু সারারাত ধ্যান জপে কাটিয়ে দিলে। সকালে যখন উঠল, সকলে জানল সে ঘুমিয়ে উঠল।

প্রথম বয়সে খেটেখুটে তাঁর আস্বাদ পেতে হয়। একবার যে আস্বাদ পেয়েছে সে আর যায় কোথায় ? তার ধড় থেকে মাথা নামিয়ে নিলেও সে আর তাঁকে ছাড়তে পারে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, যারা ঘুমের জন্য বড় কাতর হয় তারা যদি প্রথম প্রথম দিনে ঘুমিয়ে নেয় এবং রাতে জাগে সেও ভাল। সাধনভজনের সুন্দর সময় সন্ধিক্ষণ ও নিশীথ রাত্রি। মানুষ সাধারণতঃ সেই সময়টা বাজে নষ্ট করে।

ঠাকুর রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না। তাঁর কাছে যে ছেলেরা থাকত তাদেরও রাত্রে ঘমুতে দিতেন না। সকলে ঘুমুলে নিশীথ রাত্রে তাদের ঠেলে তুলে দিতেন। কি বলতেন জানিস ?—"তোরা ঘুমুবি কিরে ? ঘুমুবার জন্য এখানে এসেছিস ?" সকলকে উঠিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে ধ্যান-ধারণা করবার জন্য কাউকে পঞ্চবটীতে, কাউকে মার মন্দিরে, কাউকে বা শিবমন্দিরে পাঠিয়ে দিতেন। তারাও আদেশ-মত ধ্যান-জপ করে আবার এসে শুয়ে পড়ত। এই রকম করে সকলকে খাটিয়ে নিতেন। তিনি আর একটি কথা বেশ বলতেন—"রাত্রে তিন জন জাগে—যোগী, ভোগী ও রোগী। তোরা সব যোগীর দল, রাত্রে ঘুম তোদের জন্য নয়।"

স্থান—বেলুড় মঠ

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

আজ মঠে মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং শরৎ মহারাজ উপস্থিত আছেন। খাবার পঙ্‌ক্তিতে একজন সাধু প্রচার করে দিলে

যে, আজ চারটার সময় মহারাজের বারান্দায় সভা হবে, সাধু-ব্রহ্মচারী সকলকে সে সময় উপস্থিত থাকবার জন্য মহারাজ বলেছেন। চারটার সময় সকলেই সভায় উপস্থিত হলো। একজন সাধু মহারাজকে প্রশ্ন করলেন।

প্রশ্ন—মহারাজ, Relief work (দুর্ভিক্ষ-নিবারণ ইত্যাদি কাজ) ছেলেরা করতে চায় না। কি করে এই সব চলবে?

মহারাজ—কে কাজ করতে চায় না?

যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি একজনের নাম করলেন।

মহারাজ—হ্যাঁরে, কেন তোরা কাজ করতে চাসনে?

উত্তর—Relief work করতে গিয়ে সারাদিন খাটতে হয়, সেইজন্য সাধনভজন করবার সুবিধা হয় না—সময়ও পাওয়া যায় না।

মহারাজ—বরাবর কি ঐরূপ খাটতে হয়?

উত্তর—না, মহারাজ, প্রথম প্রথমেই বেশি খাটুনি পড়ে।

মহারাজ—তবে সময় পাওয়া যায় না বলছিস? দেখ বাবা, তোদের মুখে ও সব কথা শোভা পায় না। তোরা সাধু ব্রহ্মচারী লোক, তোদের ভিতর ব্রহ্মচর্যের একটা শক্তি রয়েছে। তোদের ধ্যান-ভজন ও কাজকর্ম এক সঙ্গে করতে হবে। এটা করে ওটা পারিনে—ও তো গৃহস্থের কথা। আমার ধারণা তোদের ভজনে স্পৃহা নেই—কেবল কাজকর্ম, হইচই ও আড্ডা দিয়ে সময় কাটাস, আর মুখে বলিস, ধ্যান-ভজনের সময় পাই না। Relief work-এ প্রথম প্রথম না হয় কিছু খাটাখাটুনি হয়, বরাবর তো আর সে রকম থাকে না? তখন সাধনভজন করিস নে কেন? তোদের ওসব কথা বলতে লজ্জা হয় না?

ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের কত কাজ করতে হয়েছে। সাধু হয়ে উকিল, এটর্নির বাড়ি পর্যন্ত ঠাকুর ছুটাছুটি করিয়ে নিয়েছেন। তাতে

আমাদের কোন অমঙ্গল হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আমরা জানি সবই তাঁর কাজ।

মহারাজের কথা শুনে সকলেই চুপ করে আছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ উপস্থিত সকলকে মঠে আর কি অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্ন আছে জানাতে বললেন। কেহই আর বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করছে না দেখে মহারাজ একজন সাধুকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?

উত্তর—পূর্বে আমি পড়াশুনার অসুবিধা বোধ করতুম। এখন ভজনে বেশ মন লেগেছে, এখন আর কোন অসুবিধা নেই। অন্য আর একজন সাধু বললে, মঠে পড়াশুনার বড়ই অভাব—একজন পণ্ডিত থাকলে ভাল হয়।

মহারাজ—কেন? তুমি তো শুকুলের (স্বামী আত্মানন্দের) কাছে পড়ছ। শুকুল তো পণ্ডিত লোক, আবার ভাল সাধু।

* * *

মহারাজ নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আবার বলতে লাগলেন, স্বামীজী আমেরিকা যাবার আগে আমাকে ও হরি মহা-রাজকে আবু পাহাড়ে যে চিঠি লেখেন তার এই কথাগুলি আমার জ্বলন্ত মনে রয়েছে। হরি ভায়াও সে কথাগুলি প্রায়ই উত্থাপন করেন। সে কথাগুলি হচ্ছে—"জগদ্ধিতায় বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।" উঃ! কি ভয়ানক কথা বল দেখি? এ কথার কি মূল্য আছে!

তোমাদের ভিতর শুনতে পাই, কেহ কেহ বলে, মিশনের সব কাজগুলো সাধনের অন্তরায়—Relief work ইত্যাদি করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। বাবুরাম মহারাজ ও আমি নাকি ওগুলো

prefer (পছন্দ) করি না। এ সব ধারণা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ভাব তোমরা বুঝতে পার না। তোমাদের উচিত—ভাবটা নেওয়া। অবশ্য আমি একথা পুনঃপুনঃ বলি এবং এখনো জোর করে বলছি যে, দুর্ভিক্ষনিবারণকার্য ইত্যাদি যে কাজই করতে যাও, সকাল-সন্ধ্যায় এবং কর্মের শেষে এক একবার ভগবানকে ডেকে নেবে—জপ-ধ্যান করবে। স্বামীজীর মুখে প্রায়ই শুনতুম "Work and worship"—কাজও কর, ধ্যান-জপও কর। তবে বিশেষ কোন কাজের pressure-এ (চাপে) এক আধদিন হলো না, সে আলাদা কথা। দিনরাত কি কেউ জপ-ধ্যান করতে পারে ? কাজে কাজেই তাকে নিষ্কাম কর্ম করতেই হবে। তা না কর, নানাপ্রকার কুচিন্তা, বাজে চিন্তা মনে আসবে। তার চেয়ে ভাল কাজ করা কি ভাল নয় ? গীতা এবং অন্যান্য সকল শাস্ত্র তো ঐ কথাই জোর করে বলেছেন দেখতে পাবে। আমিও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

* * *

তোমাদের চোখের সামনে কি ভয়ানক লড়াই (ইওরোপে) হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না ? ওরা তুচ্ছ স্বদেশের জন্য স্ত্রীপুত্র, ভোগ-বিলাস সব ত্যাগ করে নিজের নিজের কাঁচা মাথা দিচ্ছে, আর তোমরা তাদের চেয়েও এক মহত্তর উদ্দেশ্যে—ভগবানলাভের জন্য, জগতের হিতের জন্য—বাড়িঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর! স্বামীজী আমাদের বলতেন, "ওরে, বহুজনহিতায় যদি একটা জন্ম বৃথাই গেল এরূপ মনে করিস—তা গেলই বা। কত জন্ম তো এমন আলস্যে বৃথা গেছে—একটা জন্ম না হয় জগতের কল্যাণের জন্যই গেল, ভয় কি ?" আর ভয়েরও কোন

কারণ নেই। শাস্ত্র বলেছে নিষ্কাম কর্ম করলে ভগবানলাভ হয়। গীতায় আছে—

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥"

একটানা গেরুয়া পরে হৃষীকেশ গিয়ে, দুখানা রুটি ভিক্ষা করে খেয়ে দুচারটে শ্লোক মুখস্থ করলেই কি সাধু হলো নাকি? দেখছি তো তোমাদের ভিতর যারা যারা হৃষীকেশ গিয়েছিলে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি করে এসেছে! কেউ বা রোগে পড়ে আবার সেই মিশনের আশ্রয়ে ঢুকলে। কেন, এমন বৈরাগ্য নেই যে গাছতলায় পড়ে থাকব! মিশনের কাজ করব না বলে সরে পড়লুম, আবার সেই মিশনের সেবা নিতে আসব? দুমাস হৃষীকেশ, দুমাস লছমনঝোলা, দুমাস কনখল, দুমাস উত্তরকাশী, দুমাস রামেশ্বর—এই রকম এখানে ভাল লাগছে না সেখানে, আবার সেখান থেকে অন্যত্র। এই যৌবনে এই রকম করে যদি ঘুরে বেড়াও শেষে যে ভবঘুরে হয়ে পড়বে—জীবন অতি দুঃখে কাটবে। ঐ দেশে দুচারটে সাধু পাওয়া যায় যাদের সঙ্গ করা যায়, আর সব ঐ ক্লাশের। দুটো শ্লোক মুখস্থ করে রেখেছে আর তাই আওড়াচ্ছে, ব্যস! স্বামীজীর এই মঠ-টট করবার উদ্দেশ্য, পরে যারা সাধু হবে তারা ঐ টানে না পড়ে যাতে আদর্শের দিকে এগুতে পারে। তা না হলে তিনি নিজে তো বেশ সুখে কাটিয়ে যেতে পারতেন। এত কষ্ট করে মঠ-টট করবার দরকার কি?

স্বামীজী একদিন বললেন, "দেখ, আজকালকার ছেলেরা যারা সব আসবে, তারা তো দিনরাত ধ্যান-ভজন নিয়ে থাকতে পারবে না—তাই এই সব সেবাকার্য প্রভৃতি খোলা।" দিন রাত যদি কেউ ধ্যান, ভজন, পাঠ নিয়ে থাকতে পারে সে তো উত্তম কথা।

কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না, শেষে কুড়েমির আশ্রয় করে থাকে। ভাল কাজের একটা ফল আছেই আছে—সেটা যাবে কোথায়? সেই ফলই তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দেবে। দেখছি, হৃষীকেশে যারা দু-চার বছর কাটিয়ে আসছে তাদের চেয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে ধ্যান-ভজন, কাজ-কর্ম নিয়ে আছে, তারা বেশ উন্নতি করছে। তোমরা এটা বেশ জেনো, যারা কাজে ফাঁকি দেবে তারা নিজেরাই ফাঁকে পড়বে।

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৮

ভগবানের নাম করলে দেহমন শুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর নামে এমনি বিশ্বাস হওয়া চাই—আমার আর ভয় কি, আমার আবার বন্ধন কি? তাঁর নাম করে আমি অমর হয়ে গেছি, এরকম বিশ্বাস করে সাধন করতে হবে।

সাধনভজন করবার উদ্দেশ্য কি?—তাঁকে জানা, তাঁর কৃপা লাভ করা। কাম-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে—তা ধুয়ে সাফ কর। কত জন্ম ধরে ময়লা পড়ে পড়ে মনে বেজায় ময়লা ধরে রয়েছে, তাকে ধুয়ে সাফ করতে না পারলে হাজার চেষ্টা কর কিছুই হবে না। চিত্তশুদ্ধি না হলে তাঁর কৃপালাভ করা যায় না। ঠাকুর একটি বেশ উপমা দিতেন—"ছুঁচ কাদা মাটি ঢাকা থাকলে চুম্বকে টানে না, কাদা মাটি ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে।" তেমনি তাঁর স্মরণ-মনন করলে, সরল প্রাণে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে, হে ঈশ্বর, এমন কাজ আর করব না বলে অনুতাপ করলে, খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে মনের ময়লা সব ধুয়ে যায়। তখন

ঈশ্বররূপ চুম্বক মনরূপ ছুঁচকে টেনে নেন। মন শুদ্ধ হলেই তাঁর কৃপা হবে—কৃপা হলেই দর্শন হয়।

ঠাকুর সার্জন সাহেবের কথা বেশ বলতেন—"সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়, তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জন সাহেবকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়—বলতে হয়, 'সাহেব, কৃপা করে আলোটি তোমার মুখের উপর ধর, তোমায় একবার দেখি।' ঈশ্বরের কৃপা পেতে হলে, তাঁর দর্শনলাভ করতে হলে কাতর প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর আলো যদি কৃপা করে একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন তাহলে দর্শনলাভ হয়।"

যতক্ষণ ভোগবাসনা থাকে, ততক্ষণ তাঁকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছোট ছেলে খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে, সন্দেশ নিয়ে ভুলে থাকে; যখন খেলনা বা সন্দেশ আর ভাল লাগে না, তখন মার কাছে যাবার জন্য ছটফট করে ও কাঁদে। মানুষেরও সেইরূপ ভোগবাসনা শেষ হলে ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন কি করে তাঁকে পাবে এই চিন্তা সব সময় মনে উদিত হয়।

সৎ বাসনা সহজে কি মনে জাগে? যাদের সৎ বাসনা জেগেছে তাদের উপর ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে জানবি। এই মহামায়ার রাজ্যে মানুষ কত রকমে ধাক্কা খায়—কত কষ্ট পায়, তবু কি রাস্তা বদলাতে চায়? যদি কেউ সদ্বুদ্ধি দেয়, চটে যায়। ঐখানেই মজা, জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, তবু তাতেই বার বার হাত দেবে। শুধু তাই নয়, আরও দশ জনকে ডেকে নিয়ে যাবে। যদি কেউ তাদের মতে মত না দেয় তাকে পাগল বলবে, সম্ভব হলে মারপিট করতেও ছাড়বে না।

দেখিস নে ছেলে যদি সাধু হয়, সদ্ভাবে জীবন কাটাতে চায়, guardian-রা (অভিভাবকরা) তাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়, কিন্তু ছেলে যদি দুর্দান্ত হয়ে নিজের ও দশের অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহলে তাকে শুধরাবার sufficient care (যথেষ্ট যত্ন) নেয় না। সদ্ভাবে চললেই যত গণ্ডগোল! কোন রকমে তাকে নিজেদের standard-এ (আদর্শে) নামিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। একজন সাধুর বাপ মঠে বলেছিল, "ও যদি সাধু না হয়ে মরে যেত তাহলে আমি বেশি খুশি হতুম। যমে নিলে উপায় নেই। ওর উপর আমার কত ভরসা ছিল! ওর কখনো ধর্ম হবে না। আগে যদি জানতুম ও এমন হবে, তবে আঁতুড়েই নুন খাওয়াবার ব্যবস্থা করতুম—সব লেঠা চুকে যেত।" এরই নাম সংসার! এটা বোঝে না, ছেলে যদি ঠিক ঠিক সাধু হয়, ছেলের কল্যাণে তাদেরও কল্যাণ হবে।

সামান্য কারণে মানুষ এত চঞ্চল হয়ে উঠে যে, একটু ভেবে চিন্তে কিছু করবার ধৈর্য তারা হারিয়ে ফেলে। একবার এক মিনিটের জন্য ভেবেও দেখে না যে, এ কাজটা করলে আমার ভাল হবে কি মন্দ হবে। শুধু তাই নয়, ছেলে-মেয়েদেরও এমন ভাবে train (তৈরি) করে যে, ভবিষ্যতে তারাও তাদের মতো ধাক্কা খায়। একে তো জন্ম-জন্মান্তরের কত সংস্কার রয়েছে, তার উপর ছেলে-বেলা থেকেই তাদের tendency (মতিগতি) ভোগবাসনার দিকে যাতে যায় সেরূপ ভাবে train (তৈরি) করবে। এই সব আপদ-বিপদ কাটিয়ে যারা বেরিয়েছে বা বেরুবার চেষ্টা করছে তারা কি কম ভাগ্যবান?

তাঁর কৃপায় একবার যখন বেরুতে পেরেছিস, দেখিস যেন এ opportunity (সুযোগ) হেলায় হারাসনি। উঠে পড়ে লেগে খুঁটি পাকড়ে নে। আর কোন দিকে তাকাস নে। একমাত্র তাঁর

দিকে চেয়ে থাক। তিনি সব ভার নেবেন। তখন সব বাসনা দূর হয়ে যাবে।

এই বুদ্ধি নিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? মানুষের কি শক্তি আছে? তাঁর শরণাগত হ। তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁকে ভালবাসতে হবে—তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। যদি পাগল হতে হয় তবে সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবি—তাঁর জন্য পাগল হ।

জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়। সাধন করে এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে এগিয়ে গেলে শেষে জানতে পারবি যে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। একটু জপতপ করে সামান্য কিছু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করিস নে যে, যা হবার তা হয়ে গেছে। আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবেই তাঁকে লাভ করতে পারবি, তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবি—ক্রমে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ হবে।

তর্ক ও বাদ-বিসংবাদ অনেক তো করলি, আর কেন? এখন সব মনটা কুড়িয়ে তাঁর দিকে দে। মনকে বল—মন, ঈশ্বর-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। সব ছেড়ে ছুড়ে এসে সব মন যদি তাঁতে না দিস, বাজে জিনিস নিয়ে থাকিস, তাহলে ইহকাল-পরকাল দুই-ই গেল জানবি। তিনি কৃপা করে সদ্বুদ্ধি যখন দিয়েছেন তখন তাঁর কৃপার সদ্ব্যবহার কর। ক্ষণিক সুখলাভের জন্য অনন্ত সুখকে বলি দিস নে। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, "হে প্রভু, তোমার কাছে যাবার জন্য রাস্তায় যে সমস্ত আপদ-বিপদ আছে তা কাটিয়ে যাবার শক্তি সামর্থ্য আমায় দাও।" একবার তাঁর আস্বাদ পেলে এ সংসারের সব জিনিস তুচ্ছ হয়ে যাবে—আলুনী বোধ হবে। সংসারে আছে কি?

অর্থ বল, মানযশ বল, পরিবার বল, ছেলেপিলে বল, কিছুতেই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না—বরং দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

চোখের সামনে যত ভোগসুখ দেখছিস, চোখ বুজলে সব অন্ধকার। এই যে ভোগের জিনিস রয়েছে, এরা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে তোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে রাস্তা চলবি, না আলোয় আলোয় রাস্তা চলবি? আলোর আভাস যখন পেয়েছিস তখন আর ওদিকে তাকাস নে। ওদিকে গেলেই ডুবে যাবি। ভোগবাসনার influence (প্রভাব) এত বেশি যে, মনে কোন রকমে যদি একটা ছাপ তারা মারতে পারে তো হড়হড় করে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে, তোকে বুঝতেও দেবে না যে, তুই নিচে নেমে যাচ্ছিস। এই সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চরণে বিকিয়ে দেওয়া। তাঁর বলে বলীয়ান না হলে কারও সাধ্য নেই মায়ার এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে। মানুষের সাধ্য কি তাঁর ধারণা করে? তিনি কৃপা করে যাদের বোঝবার সামর্থ্য দেন তারাই বুঝতে পারে। যারা তাঁর কৃপা পেয়েছে তারাই কেবল সংসারজাল কাটিয়ে ভক্তিমুক্তির অধিকারী হয়।

স্থান—বেলুড় মঠ

১৯১৮

তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁর চরণে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। যাঁকে জানি না, চিনি না, কেমন করে তাঁকে ভালবাসব, কেমন করে তাঁর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেব—এই প্রশ্ন

স্বতই মনে ওঠে। একজন লোক ঠাকুরকে একদিন বলেছিল, 'আমার ভগবানকে ডাকতে মন যায় না।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কাকে ভালবাস ?" উত্তরে সে বললে, 'আমার একটা ভেড়া আছে, তাকে আমি ভালবাসি।' ঠাকুর সে কথা শুনে বললেন, "বেশ তো, যখনই তুমি ঐ ভেড়াটাকে খাওয়াবে, যখনই তার সেবা করবে, তখন মনে মনে ভাববে ভগবানকে খাওয়াচ্ছি, তাঁর সেবা করছি। এইরূপ মনে-প্রাণে ঠিক ঠিক কর দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গুরুকরণ যারা করেছে, গুরু তাদের পারের রাস্তা দেখিয়ে দেন এবং রাস্তার বাধাবিঘ্ন যা কিছু সব দূর করে দেন। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করে তিনি যেমনটি বলেছেন করে যা। দেখবি মনের ময়লা সব কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলো আসবে। গুরুর প্রতি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হলেই সব কাজ হয়ে গেল। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। শিষ্যের নিকট গুরু প্রত্যক্ষ ভগবান। গুরুপ্রণামে আছে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গুরুর পূজা, গুরুর ধ্যান ও চিন্তা করতে করতে দেহ মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন গুরু শিষ্যকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিয়ে সরে যান। শুদ্ধ আধার, শুদ্ধ মন না হলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না।

ঠাকুর বলতেন—"সদ্‌গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।" গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যায় না, সংসার-বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করেনি, তাঁর আদেশ পায়নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসার-বন্ধন মোচন

করে। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি। রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।

"সংসার কেমন ?—যেমন আমড়া। শস্যের সঙ্গে খোঁজ নেই কেবল আঁটি আর চামড়া—খেলে হয় অম্লশূল।" তোরা ছেলে-মানুষ। তোদের মন এখন নিজের কাছে আছে, এখন থেকে যদি চেষ্টা করিস তো সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবি। ছেলেবেলায় মন অল্পতে স্থির হয়। একটু বয়স হলে তখন কিছু করা শক্ত হবে। বৈষ্ণবদের বেশ একটি কথা আছে—

"গুরু, কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥"

গুরু তো যথেষ্ট কৃপা করেছেন, ভগবানের কৃপায় সদিচ্ছাও জেগেছে, সাধুসঙ্গও মিলেছে, এখন একের দয়া কিনা মনের দয়া হলেই হয়। মনকে বশে আনতে পারলে তবে এঁদের দয়া বুঝতে ও ধারণা করতে পারা যায়। যে কোন উপায়ে মনকে বশে আনতে হবে। মন যদি বশে না এল তো সব গেল। মনের স্বভাবই হচ্ছে এই যে, ভগবদ্‌ভাব থেকে টেনে এনে বিষয়ে নাবিয়ে দেওয়া।

তাই তোদের বলি—সাবধান, মন এখনো দৌড়তে শেখেনি। দৌড়তে শেখবার আগে রাশ টেনে ধর। মাহুত যেমন একটা প্রকাণ্ড হাতিকে training (শিক্ষা) দিয়ে নিজের ইচ্ছামত চালায়, সেই

রকম মনকেও এমন ভাবে train (তৈয়ার) করতে হবে যে, সে যেন তোমার হুকুম মতো চলে—তোমাকে যেন সে বশে আনতে না পারে। মনকে train করবার একমাত্র উপায়, তাকে ভোগবাসনা ত্যাগ করান। মন থেকে ভোগবাসনা উঠে গেলে সে তখন তোমার দাস হয়ে যাবে। সেইজন্যই গীতাদি শাস্ত্র ত্যাগের এত মহিমা প্রচার করেছেন।

ত্যাগ ত্যাগ। ত্যাগ ভিন্ন রাস্তা নেই। ত্যাগের মহিমা তাদেরই ধারণা হবে যাদের মন এখনো সংসারে ছড়িয়ে পড়েনি। ঠাকুর বলতেন—"টেঁয়াপাখীর কাঁটী উঠলে আর পড়ে না।" কাঁটী উঠবার আগে যে বুলি শেখাও শিখবে, কাঁটী উঠলে কেবল ট্যাঁট্যাঁ করবে। ছেলেবেলায় ভগবানের কথা শুনলে মনে বেশ একটা ছাপ পড়ে, একটু চেষ্টা করলে সহজে বুঝতে ও ধারণা করতে পারে।

ছোট ছেলেদের কেমন সরল বিশ্বাস—যা শোনে বিশ্বাস করে, আর সেটি জীবনে ফলাবার চেষ্টা করে। তাদের কুড়নো মন যে দিকে লাগায় successful (কৃতকার্য) হয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মন সন্দিগ্ধ হয়, সব জিনিসকে সন্দেহ করতে শেখে। শেষে মনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কোন কিছু বিশ্বাস করা তার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়। এই বয়সে যা করবার করে নে। ঠাকুরকে দেখেছি ছোট ছেলেপিলেকে ত্যাগের কথা শেখাতেন। ভগবানলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই ভাবটি তার মনে বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টা করতেন। তিনি জানতেন, এরাই তাঁর ভাব ঠিক ঠিক নিতে পারবে। তোদের এখনো অল্প বয়স রয়েছে, মনটাও বেশ সরল—সব বাসনা ছেড়ে দিয়ে এ সময় তাঁর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দে।

রাম ও কাম এক সঙ্গে হয় না। একটা না ছাড়লে আর একটাকে ধরা যায় না। বড় জিনিসের আস্বাদ না পেলে ছোট

জিনিসকে ছাড়া যায় না। এই সময় তাঁর ভাব ষোল-আনা মনে লাগিয়ে নে, তাঁকে আপনার করে নে। তিনি আমার সব, এই ভাবটি পাকা হয়ে মনে গেঁথে গেলে আর কোন গোল থাকবে না—কোন কালে কেউ তোর অনিষ্ট করতে পারবে না। তাঁর আস্বাদ পেলে দুনিয়ার ভোগ কি আর ভাল লাগে? সব ভোগ-সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়, আলুনী লাগে। মিছরির পানা খেলে কেউ কি আর চিটেগুড়ের পানা খেতে চায়? এ জীবনটা তাঁকে দিয়ে দে, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। শরণাগত! শরণাগত! শরণাগত!

স্থান—বেলুড় মঠ

১৭ মার্চ, ১৯২২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। মঠে ঠাকুরের আরতি হচ্ছে। গঙ্গার দুই ধারে অনেক দেবদেবীর মন্দির থেকেও আরতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মহারাজ বারান্দায় স্থিরভাবে বসে আছেন। সম্মুখে কয়েকজন ভক্ত বসে আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ একে একে এসে মহারাজকে প্রণাম করে সেখানে বসল। একজন ভক্ত এসে প্রণাম করে দু-একটি প্রশ্ন করলে।

প্রশ্ন—মহারাজ, তপস্যা কাকে বলে?

মহারাজ—তপস্যা নানারকম আছে। অনেকে ব্রত নেন যে দীর্ঘকাল বসবেন না। আমি একটি সাধুকে দেখেছি—তিনি বার বৎসর বসবেন না ব্রত নিয়েছিলেন। আমি যে সময়ে তাঁকে দেখেছি, সে সময়ে তাঁর ব্রত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আর পাঁচ-ছয় মাস

মাত্র বাকি। ক্রমান্বয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পা ফুলে গোদের মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঘুমুবার জন্য একটি দড়িতে ভর দিতেন। একটা কাঠেতে দড়ির দুই দিক বাঁধা থাকত। সেই দড়ি ধরে রাত্রে তিনি ঘুমুতেন। আর এক রকম তপস্যা আছে—শীত-কালে সারারাত জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে জপ করা। আর এক রকম আছে—গরমকালে দুপুরবেলা যখন মাথার উপরে সূর্যের তেজ, তখন চারিদিকে আগুন জ্বেলে তার মধ্যে বসে জপ করা। আর এক রকম আছে—পেরেকের উপর দাঁড়িয়ে বা বসে জপ করা।

প্রশ্ন—এই কি প্রকৃত তপস্যা?

মহারাজ—ভগবান জানেন। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য ঐরূপ করে। তারা আশা করে পরজন্মে রাজা হবে বা এ জগৎ ভাল করে ভোগ করবে।

প্রশ্ন—তাঁরা ঐরূপ ফল পান কি?

মহারাজ—ভগবান জানেন।

প্রশ্ন—তবে প্রকৃত তপস্যা কি?

মহারাজ—এ সব প্রকৃত তপস্যা নয়—যে-কেউ অভ্যাস করলেই করতে পারে। শরীরকে জয় করা সোজা। মনকে জয় করা, কাম-কাঞ্চন নাম-যশের বাসনা জয় করা ভয়ানক শক্ত।

আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম—সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্যখোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কার্যে। দ্বিতীয়—কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয়—বাসনাজয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে। এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন আসল তপস্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সকলের চেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বার বৎসর কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবানলাভ করা

খুব সোজা। এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সুক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত। এইজন্য সন্ন্যাসীদের এত কঠোর নিয়ম। সন্ন্যাসী কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। ইহা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা হলে প্রত্যেক জিনিসেই তাঁর বিভূতি দেখবে। ব্রহ্মচর্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।

প্রশ্ন—এটা খুব দুঃখের কথা যে, আমাদের যুবকদের এ বিষয়টা কেউ জোর করে বলে না।

মহারাজ—আগে যুবকদের গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা ছিল। সে সময় তারা ব্রহ্মচারী থাকত। তারপর তারা ঘরে ফিরে গিয়ে বিবাহ করত। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করার ফলে বিবাহের পর যখন তাদের ছেলেপুলে হতো, তারা বেশ বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান হতো। আর যারা সন্ন্যাসী হতো, তারা জঙ্গলে গিয়ে ভগবৎ-উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করত।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্যের এই ভাবটি জানে। বালকদের তারা ব্রহ্মচারী বলে। কিন্তু এগুলি এখন কথার কথা দাঁড়িয়েছে। মহারাজ, সকল জাতের ভিতর কি এই ভাবটি প্রচার করা যেতে পারে না?

মহারাজ—হ্যাঁ, ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে সঙ্গে জাপক হওয়া চাই, তা না হলে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা যায় না।

স্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

কনখল, হরিদ্বার

১৯১২

এ স্থান বড় পবিত্র, এখানে ধ্যানজপ জমাতে বড় কষ্ট পেতে হয় না—very atmosphere-ই (আবহাওয়াই) ভাল! মা-গঙ্গা রয়েছেন, আর হিমালয়ের এমন গম্ভীর ভাব—আপনা থেকে মন যেন শান্ত গম্ভীর হয়ে আসে। হাওয়ায় অনাহত ওঁকারধ্বনি হচ্ছে। এমন স্থানে এসে, এ স্থানের advantage (সুযোগ) না নিয়ে খালি ঘুমিয়ে সময় কাটিয়ে কি হবে? এখানে সাধনভজন করতে করতে শরীর যদি চলে যায়, সেও ভাল।

মনুষ্যজন্ম তো জ্ঞান-ভক্তি লাভের জন্যই। তা যদি না হলো, মিছে বেঁচে থেকে লাভ কি! পশুর মতো খেয়ে, ঘুমিয়ে, কতকগুলি ছেলেপিলে নিয়ে থাকার জন্য এ জীবন নয়। নরশরীরে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। এটি বুঝবার ও ধারণা করবার চেষ্টা কর। শুনিসনি ঠাকুরের ছেলেরা সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য কত কঠোর তপস্যা করেছেন? তাঁরা জ্বলন্ত আগুন দেখেছিলেন। কাজেই তাঁরা যতটা পেরেছেন, তোরা ততটা পারবিনি।

তোদের সাধনভজনের সুবিধা হবে বলে স্বামীজী প্রাণপাত করে এত ব্যবস্থা করেছেন! আহা! তোদের সুবিধা করবার জন্য over-exertion (অতিরিক্ত পরিশ্রম) করে করে তাঁর life (আয়ু) এত কমে গেল। কি ভালবাসা তাঁর ছিল! তোরা নিমকহারাম হসনি। বাংলার উপর তাঁর খুব আশাভরসা ছিল। Young Bengal

(বাংলার যুবক) তোরা। তাঁর mission (কার্যের ভাব) তোদের trust (ন্যস্ত) করে দিয়ে গেছেন—তোরা বিশ্বাসঘাতক হসনি। ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ হয়েছেন, তাঁর কথা ঠাকুরের কথা বলে জানবি। ঠাকুর এত বড় ছিলেন যে সাধারণ মানুষের মন দিয়ে তাঁকে বুঝা শক্ত। স্বামীজী সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সর্বসাধারণের সামনে তাঁকে ধরে গেছেন। যে-কেহ ভাগ্যবান তাকে এই পতাকার নিচে আসতেই হবে।

স্বামীজীর বই ভাল করে পড়বি। যেখানে বুঝতে না পারবি, শুদ্ধানন্দ কিংবা ঐরূপ অন্য কারও কাছ থেকে বুঝে নিবি। তিনি সাধারণের উপযোগী করে ঠাকুরের ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাব না বুঝে ঠাকুরের ভাব নিতে যাওয়া পাগলামি। স্বামীজীর বই ও ঠাকুরের উপদেশ খুব করে পড়। খুব জপধ্যান কর। এখন মনকে গড়তে না পারলে পরে পস্তাবি। Best part of life (জীবনের সর্বোত্তম অংশ) এইটি। এর সদ্ব্যবহার কর। মনটাকে একবার গড়ে নিতে পারলে আর ভয় নেই। তখন তাকে যে দিকে ফেরাবি সেই দিকেই ফিরবে। Trained (শিক্ষিত) ঘোড়ার মতো মনটাকে control-এ (বশে) আনতে হবে। মনটা যদি control-এ এসে গেল তো অনেকটা কাজ এগিয়ে গেল। মনকে always (সর্বদা) whip (কশাঘাত) করবি। একটু বেচাল হলেই জোরসে চাবুক লাগাবি, সর্বদা ধমকাবি। একচুল এদিক ওদিক হতে দিবিনি।

সাধনভজনের প্রথম অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম করা খুব ভাল—এত সময় জপ করব, এত সময় ধ্যান করব, এত সময় পাঠ করব ইত্যাদি। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক I must follow my routine (আমার নিয়ম আমি মানবই)—এই রকম একটা গোঁ

রাখতে হয়। কিছুদিন এইরকম ভাবে চললে একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। এখন যেমন ধ্যানজপ করতে ভাল লাগে না, তখন ঠিক উল্টো হবে। ধ্যানজপ না করলে মনে কষ্ট হবে। মনের অবস্থা যখন এই রকম হবে, তখন ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস বুঝতে হবে। খেতে না পেলে, ঘুমুতে না পেলে যে রকম কষ্ট হয় ও মন ছটফট করে, ভগবানের জন্য মনের অবস্থা যখন ঐরূপ হবে তখন বুঝবি তিনি তোর অতি সন্নিকটে।

প্রথমে অমৃতের সন্ধান করে নে, অমর হয়ে যা—তারপর যা হয় হবে। তিনি আঁস্তাকুড়ে বা সিংহাসনে রাখুন, ক্ষতি নেই। লোহা পরশমণি ছুঁয়ে একবার সোনা হয়ে গেলে আর ভাবনা নেই—মাটিতে ফেলে রাখ বা সিন্দুকে পুরে রাখ, সোনা সোনাই থাকবে। ঠাকুর বলতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে, তাঁকে জেনে নিয়ে, যে-কোন কাজ কর না কেন তাতে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তখন বেচালে পা পড়ে না।

সৎপথে থাকার বাধা অনেক—মহামায়া সহজে ছেড়ে দেন না। তাঁর কৃপা পাবার জন্য অনেক কাঁদতে হয়, অনেক প্রার্থনা করতে হয়। পূর্বজন্মের কত সংস্কার রয়েছে, আবার এ জন্মেও অল্পবিস্তর হচ্ছে। সারা জীবন এই সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চলতে হবে। সংস্কারের সঙ্গে যত বেশি লড়বে, সংস্কারও তোমাকে তত বেশি জোরে ধাক্কা দিতে থাকবে। তখন উদ্দেশ্য না হারিয়ে যে নিজের লক্ষ্য ধরে ধরে চলে যায় সেই জয়ী হয়।

মানুষের ভিতর দুটি বৃত্তি আছে—'কু' আর 'সু'। এদের দু-জনের খুব লড়াই চলে। একটি ভোগের দিকে টানতে চায়,

অপরটি ত্যাগের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এদের হার-জিতের উপর মানুষের মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব নির্ভর করছে।

ভোগবাসনাপূর্ণ জগতে মানুষ চোখের সামনে নানা উপকরণ দেখে এত মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, আর একটা দিক যে আছে তা ভাববার দরকার বোধ করে না—মনে করে, করে কিছু হবে কি না হবে ঠিক নেই, উপস্থিত অন্নত্যাগ করি কেন? অর্থাৎ ভাগবানলাভ হবে কি না হবে, আসল আনন্দ পাব কি না তার কিছুই ঠিক নেই, বরং সংসারটাকে ভোগ করা আমার আয়ত্তাধীন—এইটা ছাড়ি কেন? এ ভেবে আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেষে যখন পুড়ে ছারখার হয়ে জ্বলতে আরম্ভ করে, তখন ভাবে—তাই তো করলুম কি? তখন শান্তি চায়। Too late-এ (অতি বিলম্বে) চাইলে শান্তি পাবে কোথা থেকে? অসংযত ভাবে চলে নিজেকে এমন স্বভাবের দাস করে ফেলেছে যে, ইচ্ছা হলেও আর কিছু করবার জো নেই।

স্থান—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

কনখল, হরিদ্বার

১৯১২

সকলেই চায় সুখ, কে আর দুঃখ কষ্ট পেতে চায়? সুখ কোথা থেকে পাবে? সকল সুখের মূল ভগবানকে দূরে ঠেলে রেখে কতকগুলো বাজে জিনিসের পেছনে দৌঁড়ালে কি সুখ পাওয়া যায়? তিনি কত রকম খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, সেগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ডাক, তিনি দৌড়ে এসে কোলে তুলে নেবেন।

খেলনা চাও খেলনা পাবে; তাঁকে চাও তাঁকে পাবে—একটাকে ফেলে দিতেই হবে।

খেলা তো অনেক বার হয়েছে—এবার খেলা ফেলে মাকে ডাক। দেখ না, যে ছেলেটা খেলা ভালবাসে, মা তাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন, আর যে ছেলেটা খেলনা ভালবাসে না, খেলতেও চায় না, মা তাকে সর্বদা কাছে কাছে রাখেন, কোলে করে বেড়ান। মার কোলে থাকা কত মজা, কত আনন্দ যে মার কোলে থাকে সেই তা জানে। যে ছেলেটা খেলা নিয়ে ভুলে থাকে, সে মার কাছ থেকে শুধু খেলনাই পায়। খেলনা কিন্তু নানা অনর্থের সৃষ্টি করে। কখন হয়তো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল, কখন বা ঐ নিয়ে খেলুড়ের সঙ্গে ঝগড়া হলো, সে হয়তো দুটো চড় বসিয়ে দিলে, এই রকমে নানা দুঃখ কষ্ট পেতে হয়। যে ছেলেটা মার কোলে থাকে তার এসব ভাবনা থাকে না সে জানে, আমার যখন যা দরকার মা-ই সব দেবেন।

ঠাকুরের আম-বাগানের মালীর গল্পটি বেশ! "আম খেতে এসেছ আম খাও—কত ডাল, কত পাতা সে খোঁজ-খবরে দরকার কি? আম খাও পেট ভরবে।" জগতে এসেছিস তাঁকে লাভ করতে। তাঁকে আগে লাভ করে ধন্য হয়ে যা। নিজের চিন্তা আগে কর, নিজের পথের সম্বল আগে কর, কি জন্য এখানে এসেছিস এ প্রশ্নের মীমাংসা আগে করে নে। খাট, খাট, অমৃত-কুণ্ডে পড়ে অমর হয়ে যা, দিন রাত তাঁর কাছে প্রার্থনা কর! ভগবানের নাম ও চিন্তা যে ভাবেই করিস না কেন তাতেই কল্যাণ হবে। যে নামে যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে সে নামে সেই ভাবে তাঁকে ডাক। ডাকলেই দেখা পাবে নিশ্চিত।

পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ-রূপের খেই কোথায়?" মহাদেব বললেন—'বিশ্বাস।' তোদের তো

রাস্তা ধরিয়ে দেওয়া আছে—বিশ্বাসের সহিত সাধন কর। অমূল্য জিনিস পেয়েছিস—উঠে পড়ে লাগ, culture (অনুশীলন) কর। এই ভাবে সাধন করব, কি ও ভাবে সাধন করব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করিস নে। তাঁকে ডাকলে ফল পাওয়া যায়, তা যে ভাবেই হউক। ঠাকুর বলতেন, "মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।" তোরা তো কল্পতরুমূলে বসে আছিস—যা চাইবি তাই পাবি।

নিজেকে বেশি চালাক মনে করিসনি। নিজেকে চতুর মনে করা ভাল নয়। কাক নিজেকে খুব চালাক মনে করে বিষ্ঠা খেয়ে মরে। এ সংসারে যারা বেশি চালাকি করতে যায়, তারা কেবল ঠকেই মরে।

বিশ্বাস করে ডুব দে—অগাধ জলে ডুবে যা, বস্তু পাবিই পাবি। একটু সাধনভজন করে ঈশ্বর দর্শন হলো না বলে হতাশ হবিনি। রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে, একডুবে পেলিনে বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করিসনি।

ঠাকুর বলতেন, "সমুদ্রে একরকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্বদা হাঁ করে জলের ওপর ভাসে। কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়লে একেবারে জলের নিচে চলে যায়, আর উপরে আসে না।" তোরাও গুরুকৃপারূপ একফোঁটা জল যা পেয়েছিস তা নিয়ে এখন সাধনার অগাধ জলে ডুবে যা, অন্যদিকে আর তাকসনি।

ধৈর্য ধরে সাধন করতে থাক—যথাসময়ে তাঁর কৃপা তোর উপর হবেই। কোন ধনী লোকের কাছে যেতে হলে যেমন সিপাই সান্ত্রীর অনেক খোশামোদ করতে হয়, তেমন ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে অনেক সাধনভজন ও সৎসঙ্গ করতে হয়। তাঁকে আপনার হতে আপনার জেনে তাঁর দর্শন পাবার জন্য, তাঁর কৃপা পাবার জন্য,

সরল শিশুর মতো ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয়। ছেলের কান্না শুনলে মা কি আর থাকতে পারেন ?—তিনিও সেইরকম দৌড়ে আসেন, দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে। জাহাজ যে দিকেই থাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাসভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হলেই সে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠে। কি রকম জানিস ? যেমন চকমকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না—তুলে লোহায় ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তাঁকে লাভ করে যে ধন্য হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না, কেবল তাঁকে নিয়েই থাকে। ভগবৎকথা ও সাধুভক্তসঙ্গ ছাড়া তার কিছুই আর ভাল লাগে না। ঝড়ের এটো পাতার মতো পড়ে থাকে—নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাঁকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

তোদের মন এখনো বাসনাহীন, সরল, নির্মল। তোদের ঐ স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর। একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই—একবার ঘষলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙে গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতেও তা নষ্ট করা যায় না।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩

শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এখন ধ্যান কিংবা prayer (প্রার্থনা) কর ?"

ভক্ত—না মহারাজ, কিছুই করি না।

মহারাজ—একটু একটু করে করা ভাল। শান্তি পাবে, মন স্থির হবে। তোমাদের কুলগুরু তো আছেন ? তুমি এখনো মন্ত্র নাওনি ? মন্ত্র নিলে তো পার। একটু একটু জপ-ধ্যান করবে। একটা রুদ্রাক্ষের মালা কিনবে। তাতে ১০৮ বা ১০০০ বার জপ করবে। ইচ্ছা হলে আরও বেশি করতে পার।

ভক্ত—কি জপ করতে হবে ?

মহারাজ—ভগবানের নাম জপ করবে—যে দেবতার উপর তোমার বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয়। ভগবানকে ধ্যান করবে নিজের হৃদয়ে কিংবা বাহিরে।

ভক্ত—কোন একটা রূপ না হলে তো ধ্যান হবে না, তাহলে কি রূপ নিতে হবে ?

মহারাজ—সদ্‌গুরু যাঁরা তাঁরা ধ্যানে শিষ্যের কার উপর শ্রদ্ধা বেশি তা জানতে পারেন ও তাই বলেন। তারপর মানসপূজা আছে। লোক যেমন বাহ্যিক পূজায় ফুলচন্দন দেয়, আরতি ইত্যাদি করে, সেইরূপ মানসপূজায় মনে মনে তাঁর রূপ চিন্তা করে ঐ সব করতে হয়।

আজ থেকেই লেগে যাও। সন্ধ্যাবেলা থেকে আরম্ভ করে দাও। এখন মানসপূজাটা থাক। জপ ও ধ্যান রোজ সকাল সন্ধ্যায় কর। এইরূপ বছর দুই কর দেখি। দেখবে কেমন আনন্দ পাবে, ভাব

আসবে, আরও সব দেখতে পাবে। এর পর যা যা করতে হবে আমি বলে দেব তখন।

ভক্ত—তাহলে মানসপূজা এখন আর করব না ?

মহারাজ—না, মানসপূজা এখন থাক। যখন করতে হবে আমি বলে দেব—যখন মন্ত্র-তন্ত্র নেবে। এখন আর মন্ত্র নিয়ে কাজ নেই। খালি এইটি করে যাও। আর সময় নষ্ট করো না। লেগে যাও। একটা আসন, কম্বল বা যা হোক কিনে নিও। সেটি ভাল করে রেখে দেবে। অন্য কোন কাজে এটা ব্যবহার করবে না। কেবল মাত্র এই সব কাজে ব্যবহার করবে। তোমাদের বাগানে তো বেশ নির্জন স্থান আছে। বাড়িতে যদি কোন গোলমাল বা অসুবিধা হয় মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে করতে পার। আর এখানে কাশীর মতো জায়গায় শীঘ্র হয়ে যাবে। বছর দুই কর দেখি। কারু কারু শীঘ্রও হয়ে যায়—এক বছরেও হয়ে যেতে পারে। একবার লেগে যাও দেখি। কিছুদিন পরে এত আনন্দ পাবে যে, আর উঠতে ইচ্ছা করবে না—কেবল ধ্যান করতে ইচ্ছা হবে। বেশ সোজা হয়ে পা মুড়ে বসবে, দুটি হাত বুকের কাছে কিংবা উপর পেটের উপর রেখে [নিজে দেখিয়ে দিলেন) ধ্যান করবে। কি করে বসতে হবে আমি আর একদিন ভাল করে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেব।

মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবে। কখনো কখনো সদ্গ্রন্থ পড়বে। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবে। আসনে বসেই ধ্যান করবে না। দু-তিন মিনিট চুপ করে বসে থেকে মনকে blank (শূন্য) করতে চেষ্টা করবে, যেন অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় না হয়। তারপর ধ্যান করবে। প্রথমে বছর দুই খুব মনের জোর করে করবে, তার পরে আপনিই হয়ে যাবে। যেদিন বেশি কাজ-টাজ থাকবে, সেদিন না হয় একবেলাই করবে, কিংবা ১০।১৫ মিনিটে সেরে নেবে।

বিশেষ অসুবিধা হলে খালি একবার তাঁকে স্মরণ করে নিয়ে প্রণাম করবে। সকালে মুখ হাত পা ধুয়ে কাপড়খানি ছেড়ে বসে যাবে। একটু গঙ্গাজলও না হয় স্পর্শ করে নিও। সন্ধ্যার সময়ও ঐরূপ করো। রুদ্রাক্ষের মালাটি কিনে গাঁথিয়ে নিও। তারপর গঙ্গায় ভাল করে স্নান করিয়ে ভক্তিভাবে বিশ্বনাথ স্পর্শ করিয়ে নিও। এই সব করে যাও দেখি, দেখবে মনে শান্তি পাবে আর খুব আনন্দে থাকবে। আর morality (নীতি) বিষয়ে এই দুইটি পালন করবে—সত্য কথা বলবে ও পরস্ত্রীকে মা-র মতো দেখবে। আর কিছু করতে হবে না। এই দুটিতেই আর সব হয়ে যাবে। ঈশ্বরে খুব ভক্তি করবে। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর নেই কখনো মনে করো না। আমি বলছি ঈশ্বর আছেন—নিশ্চয় আছেন জেনো। আজ থেকে লেগে যাও, বুঝলে? দেরি করে আর কাজ নেই। আমিও আছি—মাঝে মাঝে বলে দেবো। আজ থেকেই আরম্ভ করে দাও।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

২১ জানুয়ারি, ১৯২১

মহারাজ—মোগলসরাই থেকে মোটরে করে আসতে আসতে দুধারে খোলা মাঠ প্রভৃতি দেখে মনে কোনই আনন্দ হলো না। এমনি ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য যে, যেই bridge (পুল) পার হয়ে আসা অমনি এমন একটা মাধুর্য অনুভব করলুম—কি আর বলব! শিবক্ষেত্র—শিবই গুরু! একদিকে মা-অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে বাইরের অভাব দুর করছেন, অন্যদিকে বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম দিচ্ছেন। ঠাকুরের নিকট দাড়িওয়ালা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে কাশী-মাহাত্ম্য সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মহাকালভৈরব। ঠাকুরের দেহটা তখন পড়েছিল।

সন্ধ্যা হয়েছে। মহারাজ ঠাকুর-প্রণাম করবেন তাই গঙ্গাজল চাইলেন। গঙ্গাজল আনা হলো। নিজে গ্রহণ করে উপস্থিত সকলকে গ্রহণ করতে বললেন। একে একে সকলে গঙ্গাজল গ্রহণ করল। তিনি ঠাকুর-প্রণাম শেষ করে বললেন, "গঙ্গাবারি, ব্রহ্মবারি, অভীষ্টদায়িনী—ইষ্টদর্শনের সহায়ক।" ঠাকুর বলতেন, "গঙ্গা-জল, মহাপ্রসাদ (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের), আর বৃন্দাবনের রজঃ সব ব্রহ্মস্বরূপ।"

কথাপ্রসঙ্গে বললেন, কুলকুণ্ডলিনী যখন অধোমুখে থাকেন তখন জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভির বিষয় নিয়ে থাকে, আর যখন ঊর্ধ্বমুখে থাকেন তখন ভগবান নিয়ে থাকে। সত্ত্বগুণ বাড়লে ঈশ্বরের রূপ দেখতে ইচ্ছা হয়। তাঁর নাম করতে, তাঁর ধ্যান করতে ভাল লাগে।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

২৪ জানুয়ারি, ১৯২১

প্রাতে শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি, কিছু কচ্ছিস ?'

উত্তর—না, মহারাজ, মনটা বসে না, রস পাই না; ভিতরটা কিছুতেই খুলছে না, তাই বড় অশান্তি। আমরা এমন খারাপ সংস্কার নিয়ে এসেছি যে, সেগুলি যেন সব সময় পথ obstruct (অবরোধ) করে রয়েছে।

মহারাজ—ও-রকম ভাবতে নেই। মহানিশায় জপ কর দেখি, না পারলে ব্রাহ্মমুহূর্তে ; পুরশ্চরণ কর। সময় আর নষ্ট করিস নে।

ধ্যান-ভজনে ডুবে যা। কিছু কর। কিছু করলে না আর আপনা থেকেই সব খুলে যাবে!

আর একজন সাধু প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার জন্য সকাল সকাল উঠতে পারি না। রাত্রে খেতে দেরি হয় বলে ভাল হজম হয় না। তাই সকাল সকাল উঠলেও শরীর ও মনের জড়তা যায় না, অথচ না খেলেও দুর্বল বোধ করি। এর কি করব?"

মহারাজ—রাত্রে খাওয়া কমিয়ে দাও। প্রথমে বার আনা আন্দাজ খাবে, পরে আট আনা হয়ে যাবে। প্রথমটা শরীর একটু দুর্বল বোধ হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে—বরং ঝরঝরে বোধ হবে। আমরা তখন (তপস্যার সময়) একাহারী ছিলুম। তাতে শরীর বেশ হালকা থাকত।

ঐদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) মহারাজের ঘরে উপবিষ্ট আছেন। সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁদের প্রণাম করে বসবার একটু পরে শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করে বললেন, কোন মহাপুরুষের কাছ থেকে জেনে নিয়ে methodically (যথাপদ্ধতি) সাধন করতে হয়—haphazardly (বিশৃঙ্খলভাবে) করলে কি হয়? মাঝে ছেড়ে দিলেই আবার দুনো খাটতে হয়। অবশ্য পূর্বেরটা একেবারে নষ্ট হয় না। সাধনভজন করলেই কাম-ক্রোধাদি সব চলে যাবে। এখন মন রজঃ ও তমঃতে আচ্ছন্ন রয়েছে। সেটাকে শুদ্ধ করতে হবে, সূক্ষ্ম করতে হবে, সত্ত্বগুণে নিয়ে যেতে হবে। তখন ধ্যান-জপ ভাল লাগবে, বেশি বেশি করতে ইচ্ছা হবে। তারপর মন যখন শুদ্ধসত্ত্ব হবে, তখন ঐ নিয়েই থাকবে। মন এখন জড় (তমঃতে আচ্ছন্ন); কাজেই তার জড়ের (বহির্বিষয়ের) প্রতি আকর্ষণ এই মন আবার যখন চেতন হবে তখন চেতনকে টানবে।

মন সূক্ষ্ম হলে মনের capacity (ধারণাশক্তি) বেড়ে যাবে, তখন সূক্ষ্ম ঈশ্বরীয় তত্ত্ব শীঘ্র শীঘ্র বুঝতে পারবে।

ধ্যান করবার সময় একটা আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করে নিতে হবে—তাতে nerves (স্নায়ুগুলো) soothed (শান্ত) হয়ে যাবে। ইষ্টমূর্তিকে সহাস্য আনন্দময় ভেবে চিন্তা করতে হয়, নইলে শুঁট্‌কো ধ্যান হয়ে যাবে। আর সময় নষ্ট করিস নে। রিপু সব প্রবল হয়ে রয়েছে। এখন তাদের বেগ সহ্য করতে হবে, তাতে কষ্টও হবে। সাত আট বৎসর খাট। পরে সমস্ত জীবনটা সুখে কাটাবি। এক বৎসরেই ফল বুঝতে পারবি। মেয়েরা পারছে আর তোরা পারবি নে? এই তো কাশীতে একটি মেয়ে এক বৎসরে বেশ উন্নতি করেছে, বেশ আনন্দ পাচ্ছে। মেয়েদের বিশ্বাস বেশি, তাই চট করে কাজ হয়। ঠাকুর তোদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। একটু কর না, দেখবি তিনি হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। তিনি সব বিপদ-আপদ থেকে সর্বদা রক্ষা করবেন। তাঁর কত কৃপা, এ সব কি বোঝান যায়!

এ সব যা শুনছিস, এগুলো realise (উপলব্ধি) কর। যার যেটা নিজের ভাব তাই নিয়ে প্রথমে আরম্ভ করতে হয়, পরে ভাব পাকা হয়ে গেলে সব ভাবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা চলে। Emotional (ভাবপ্রবণ) হতে নেই, feeling (ভাব) চেপে রাখতে হয়। জপের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি চিন্তা করতে হয়, নইলে জপ ভাল হয় না। পূর্ণ মূর্তির ধ্যান না হলেও যেটুকু সামনে আসে তাই নিয়ে ধ্যান আরম্ভ করবি। প্রথমে পাদপদ্ম থেকে আরম্ভ করবি। না পারলেও struggle (বারবার চেষ্টা) করবি। না এলে ছাড়বি কেন? করতেই হবে। ধ্যান কি সহজে হয়? করতে করতেই হবে। ধ্যানের next stepই (পরের অবস্থা)

সমাধি। নির্ভর প্রভৃতি যা কিছু সবই সাধনের দ্বারা ভিতর থেকে বেরুবে। তাঁকে সব ছেড়ে দে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

জানুয়ারি, ১৯২১

প্রশ্ন—মহারাজ, কেউ হৃদয়ে, কেউ মস্তকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে। আমি কিন্তু বাইরে যেরূপ দেখি, এই যেমন আপনাকে দেখছি, সেই ভাবে ধ্যান করবার চেষ্টা করি। কোন্ ভাবে ধ্যান করা উচিত?

মহারাজ—দেখ, ও সব উপাসক-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আছে। সাধারণতঃ হৃদয়ে ধ্যান করাই ভাল। দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে, বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতিদর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখনো কখনো বা দীর্ঘ প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন অনুভূতির রাজ্যে কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়। যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ, আবার কেউ কেউ বলেন ঐখানেই আরম্ভ।

প্রশ্ন—মহারাজ, সাধারণতঃ দেখা যায় মন খানিকটা এগিয়ে আর এগুতে পারে না। এর কারণ কি?

মহারাজ—ওটা মনের দুর্বলতা। মনের যতটা capacity (শক্তি) ততটা নিয়ে আর যেন নিতে পারছে না। সকলের মনের তো আর এক রকম capacity নয়। মনের capacity বাড়াতে হবে। ঠাকুর বলতেন, "ব্রহ্মচর্য থাকলে মনের শক্তি খুব বেড়ে যায়।" সে মন তখন সামান্য কাম-ক্রোধে চঞ্চল হয় না—ও সব অতি তুচ্ছ বোধ হয়। ঠিক ঠিক আত্মবিশ্বাস আসে যে, ও সব আমাকে কিছু করতে পারবে না। সাধনপথে অনেক বিঘ্ন আছে। তাই পূজাদিতে আসন, মুদ্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা।

প্রশ্ন—মহারাজ, আপনি আমাদের জনে জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, তুই কি করিস, তোর কি difficulty (প্রতিবন্ধক), ইত্যাদি। ইহাতে আমাদের খুব উৎসাহ হবে। আপনারা যদি উৎসাহ দেন তবে আমাদের খুব সাহস হয়।

মহারাজ—ও কি জান, ওটা সব সময় হয় না। কখন কখন মনের এমন অবস্থা থাকে—মনে হয় যে, পায়ে ধরে বলি, বাবা, এই কর, এই কর। আবার কখন কখন মনে হয়—আমি কি করব? ঠাকুর আছেন—তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি হচ্ছে। আর কাকেই বা বলি! তিনিই করণ, কারণ, তিনিই সব। আর বললেই বা লোকে নেবে কেন? তবে কি জান, সে দিক থেকে যদি প্রেরণা আসে তবে বললে লোকে নেয়। খুব কর, বুঝলে, খুব কর। একটু সময় যেন নষ্ট না হয়। ঠাকুর একটা দিন গেলে মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন—"মা, আর একটা দিন চলে গেল, এখনো দেখা দিলিনি!" তোমরা খুব ব্যাকুল হও, খুব তন্ময় হয়ে যাও।

প্রশ্ন—মহারাজ, কৃপা কি conditional (কারণসাপেক্ষ)?

শরৎ মহারাজ—হাওয়া তো বইছেই। যে পাল তুলবে সে পাবে।

মহারাজ—ঠাকুর বলতেন, "গরম থামাবার জন্য পাখা করে কিন্তু যেই হাওয়া আপনি বইতে থাকে তখন পাখা বন্ধ করে দেয়।"

প্রশ্ন—ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় রূপদর্শন হচ্ছে, না hallucination (মনের ভুল), কি করে বোঝা যায় ?

মহারাজ—ঠিক ঠিক দর্শনে খুব স্থায়ী আনন্দ হয়। নিজের মনই বুঝিয়ে দেয়।

প্রশ্ন—মহারাজ, মুদ্রা ইত্যাদি এসবের দরকার কি ?

মহারাজ—নানারকমের influence (প্রভাব) আছে। কখন কখন দেখবে এই বেশ মন আছে, মনে হয় এখন ধ্যান করলে বেশ ধ্যান হবে কিন্তু বসতেই হয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে মনে নানা দুশ্চিন্তা এসে মন খারাপ করে দিলে। এই আমারই এক সময়ে একটা মলিন ভাব এসেছিল। ঠাকুর আমাকে দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "তোর ভিতর একটা মলিনতা এসেছে, দেখছি।" এই বলে মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় করে বললেন, অমনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কুভাব কেটে গেল। মন উঁচুতে উঠলে এ সব influence আর সেখানে যেতে পারে না।

প্রশ্ন—শুধু ধ্যানজপ নিয়ে থাকা বড় কঠিন নয় কি ?

মহারাজ—দু-একবার পারলে না বলেই ছেড়ে দেবে কেন ? বারবার চেষ্টা করতে হয়। অভ্যাস করতে করতে সহজ হয়ে যায়।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

প্রশ্ন—মহারাজ, পূজা-পাঠ-ভজনাদির কথা যা বলেছিলেন, সেই পূজা মানে কি বাহ্য পূজা?

মহারাজ—পূজা বলতে বাহ্য ও মানস দুই-ই include (অন্তর্ভুক্ত) করে। বাহ্য পূজার উপকরণ দরকার—তা তোমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। মানসপূজাই সুবিধে। মনে মনে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দিয়ে পূজা করে মানস জপ, ধ্যান করবে। মানস জপে জিহ্বা পর্যন্ত নড়বে না। সাধারণ জপে মন্ত্র উচ্চারণ করে করতে হয়।

ধ্যানকালে ইষ্টমূর্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়—যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ (immaterial) ভাববে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তার পর জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগৎ। এ জগৎটা যেন তা ছাড়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়—যেমন উদি* কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দেখে বললে, "ভুবনেশ্বরটা কিছুই না।" তারপর মন লয় হয়ে যায়—তখন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে তা মুখে বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই—অনন্ত! অনন্ত!! এ সবই অবস্থার কথা। তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে হয়—এটা কিছু নয় মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতং'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে দেন। যেন

---

* শ্রীশ্রীমহারাজের প্রিয় বালক-পাচকের নাম।

ঘটটা ভেঙে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন—"দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। এক একটা করে সরা ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য রইল। সেটাও ভেঙে দিতে যা রইল তা-ই রইল—সত্য সূর্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে বলবে?"

প্রশ্ন—মহারাজ, ধ্যানের সময় যদি তাঁকে সর্বব্যাপী ভাবা যায়, সেটাও তো ধ্যান?

মহারাজ—এটা তো করতেই হয়, তবে একটু পরে। তখন সেই ইষ্টকে সকলের মধ্যে—জলে স্থলে, পাতায় পাতায়, আকাশে নক্ষত্রে পাহাড়ে পর্বতে-সর্বত্র অনুভব হয়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, মহারাজ, শাস্ত্রে বলে এ সব তত্ত্ব জানতে হলে গুরুসেবার দরকার।

মহারাজ—হ্যাঁ, এটা প্রথম অবস্থায় বটে, তারপর মনই গুরু হয়। গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। ভাবতে হয় তাঁর দেহটা যেন মন্দির, তার ভিতরে ভগবানই রয়েছেন। এইভাবে গুরুসেবা করতে করতে গুরুতে প্রেমাভক্তি হয়। গুরুর প্রতি এই প্রেমাভক্তিই পরে আবার ভগবানের দিকে দেওয়া যায়। গুরুমূর্তি সহস্রারে (মস্তকে) ধ্যান করে তারপর সেখানে গুরুকে ইষ্টেতে লয় করতে হয়। ঠাকুর বেশ বলতেন, "গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন, ঐ তোমার ইষ্ট। তার পর গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান।" গুরু তো ইষ্ট ছাড়া নন। কত তত্ত্ব আছে, মুখে তোমায় কি বলব? লেগে পড়। ভজন করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন কত কি বুঝা যায়, তার কি অন্ত আছে! তাই নিয়ে তখন বিভোর হয়ে থাকে। ভজন করলেই হৃদয়াদিতে ধ্যানের স্থানও বুঝা যায়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, মহারাজ, আমার মনে হয় সেই আনন্দের একটু আভাস পেলে লোক এগিয়ে যেতে পারে।

মহারাজ—আনন্দ কি বলছ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই। আনন্দ তো সাধন-অবস্থার কথা। নৌকাখানি যতক্ষণ destination-এ (লক্ষ্যস্থানে) না পৌঁছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার—পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মতো help (সাহায্য) করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জান—তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে-সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোন অভাব নেই, কোন ভয় নেই—শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন।

প্রশ্ন—মহারাজ, নিত্যে পৌঁছে তার পরে তো লীলা?

মহারাজ—তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, "সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি।" বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্য-লীলা দুইয়েরই পার।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

প্রশ্ন—মহারাজ, কুণ্ডলিনী শক্তি কি করে জাগে ?

মহারাজ—ধ্যানজপ ইত্যাদির দ্বারাই জাগে। আর কেউ কেউ বলেন, ওর বিশেষ সাধনা আছে—তদ্দ্বারা জাগে। আমার বিশ্বাস জপধ্যানের দ্বারাই জাগে। কলিতে জপধ্যানই প্রশস্ত। জপের মতো সহজ সাধন আর নেই। জপের সঙ্গে ধ্যান করতে হয়।

প্রশ্ন—ধ্যান কি, মহারাজ ? মূর্তিচিন্তা তো ?

মহারাজ—মূর্তিচিন্তা আবার নির্গুণচিন্তা, দুই-ই।

প্রশ্ন—আচ্ছা, মহারাজ! কে মূর্তিচিন্তার, কে নির্গুণচিন্তার অধিকারী—গুরুই তো সে-সব ঠিক করে দেন ?

মহারাজ—হ্যাঁ, তবে মনই গুরু। মনে কখনো মূর্তিচিন্তা করতে ভাল লাগে, কখনো বা নির্গুণচিন্তা ভাল লাগে। বাইরের গুরু তো সব সময়ে মিলে না। সাধনভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে পারে। মনই সব দেখিয়ে দেবে। যোগবাসিষ্ঠে আছে, মনের নানা দিকে স্রোত, নানা দিক দিয়ে সব শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে। কতক দেহে, কতক ইন্দ্রিয়ে, কতক বিষয়ে মনটা বাঁধা আছে। মনের সব বন্ধন কেটে ফেল, সমস্ত গুটিয়ে সেই দিকে লাগিয়ে দাও। এই তো সাধন। সমস্ত মনটাকে concentrate (একাগ্র) করে সেইদিকে লাগিয়ে দিতে হবে যতদিন না অভিলষিত বস্তু লাভ হচ্ছে। খুব খাট, লেগে পড়—এই তো বয়স। বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না। লাগ দেখি একবার জোর করে। দেখবে, মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ,

লাগ। জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়—সবই সমান। একটা ধরে ডুবে যাও। আর প্রশ্ন নয়। কিছু করে এসে বল।

জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করে বললেন, "পঞ্চদেবতার পাঁচটি স্তোত্র রোজ পাঠ করবে। ওটা সাধনের মতো হবে।"

প্রশ্ন—মহারাজ, গুরুকৃপা হলে তো কুণ্ডলিনী জাগেন?

মহারাজ—কুণ্ডলিনী জাগা কি বলছ? সব হয়ে যায়—ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত। তবে গুরুকৃপা কি অমনি হয়? অনেক খাটতে হয়। মনকে নির্জনে জিজ্ঞাসা কর, 'কি করলে?' মন জবাব দেবে, 'কিছুই করিনি।' কিছু কর, কিছু কর। লেগে পড়। আর কোনদিকে দৃষ্টি নয়। কেবল সেই জিনিস নিয়ে পড়ে থাক; ডুবে যাও। প্রথম একটা routine (নিয়মিত কার্যপদ্ধতি) করা দরকার। পরে সেই routine-টা follow (পালন) কর দেখি। মন বসুক আর নাই বসুক, জপধ্যানটা routinework-এর মতো নিত্য করা উচিত।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

প্রশ্ন—ধ্যানভজন করছি কিন্তু ওদিকে একটা taste (রস) পাচ্ছি না, যেন জোর করে করছি। এর উপায় কি?

মহারাজ—সে কি প্রথমেই হয়? প্রথমে হয় না—তার জন্য খুব struggle (চেষ্টা) করতে হয়। তোমার যা energy (কার্যশক্তি) আছে সবটা ওদিকে দাও। আর কোন দিকে দেখবে না, আর কোন দিকে energy direct (শক্তি নিয়োজিত) করবে

না। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। কখন satisfied (সন্তুষ্ট) হয়ো না। একটা অশান্তি create (সৃষ্টি) করতে চেষ্টা কর—আমার কি হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না, এই ভাবে। ঠাকুর বলতেন, "মা, আর একটা দিন কেটে গেল, এখনো দেখা দিলিনি!" রোজ রাত্রে শোবার আগে একবার চিন্তা করবে কতটুকু ভাল কাজে গেল, কতটুকু মন্দ কাজে গেল; কতটা তাঁর চিন্তা ও ধ্যানভজনে গেল, আর কতটা তমোগুণের কাজে কেটে গেল। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা মনটা strong (শক্তিসম্পন্ন) করে ফেল। বড়-লোকের বাড়িতে দারোয়ান থাকে, তার কাজ চোর, গরু ইত্যাদি তাড়ান। সেই রকম মন হচ্ছে দারোয়ান। মন যত strong হবে ততই ভাল। মনকে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে সে-ই ঠিক চলে। খুব struggle কর। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসারত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের? সময় শুধু চলে যাচ্ছে। আর এক মুহূর্তও waste (নষ্ট) করো না। খুব জোর আর তিন-চার বৎসর করতে পারবে, তারপর শরীর-মন দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয়? তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তিবিশ্বাস হোক, তারপর ডাকবে! তা কি কখনো হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, "তপঃ, তপঃ, তপঃ।" দেখছ না অবতার পুরুষদের পর্যন্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা!

বিশ্বাস কি প্রথমে হয় ? Realisation (অনুভূতি) হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু, মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্বাস করে, blind faith (অন্ধ বিশ্বাস) নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জান তো ?—স্বাতীনক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জন্য হা করে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরি করে। তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছ। যাও, ডুবে যাও।

তোমাদের একটা self-reliance (আত্মবিশ্বাস) নেই। সাধনপথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ, রজঃ ছাড়িয়ে সত্ত্বে যেতে না পারলে ধ্যানজপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মানুষজন্ম কত দুর্লভ! অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষজন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং করতে হবে। এই জন্মে খেটে খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরে সূক্ষ্ম থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" তিনিই সব, সবই তাঁর। কিছু calculate (হিসাব) করো না। Self-surrender (আত্মসমর্পণ) কি এক দিনে হয় ? সেটা হলে তো সব হয়ে গেল। সেটার জন্য খুব struggle (চেষ্টা) করতে হয়। অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের আয়ু বড় জোর এক-শ বছর ; যদি eternal happiness (অনন্ত সুখ) চাও তো এই এক-শ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

মহারাজ—সাধন-ভজন কেমন হচ্ছে ?

উত্তর—কাজের জন্য ধ্যান-জপ করবার সময় পাই না।

মহারাজ—মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল। Work and worship (কর্ম এবং উপাসনা) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারে ? কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক idiot -রা (জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা)—যাদের brain (মস্তিষ্ক) খাটাবার শক্তি নেই, কোনরকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে—আর এক মহাপুরুষরা পারেন, যাঁরা কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধন-ভজন করে, তাদেরও ঝুবড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর-স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোন বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার through (মধ্য) দিয়ে spiritual, moral, intellectual and physical (আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক) সব রকম উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর। শরীর-মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও। তাঁদের গোলাম হয়ে যাও। বল—এই শরীর-মন সব তোমাদের দিয়ে দিলুম, এর দ্বারা যা দরকার কর ; আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তখন তোমার ভার তাঁদের উপর। তোমাকে নিজে আর কিছু করতে হবে না। ঠিক ঠিক এইটি করা চাই। নইলে "রামও বলবে আবার কাপড়ও তুলবে"

—এ চলবে না। আমারও তো পাঁচ-ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। স্বামীজী আমাকে ডেকে বললেন, "ওরে, ওতে কিছু নেই—কাজ কর"। আমরাও তখন সব রকম কাজ করেছি। কই তাতে তো কিছু খারাপ হয়েছে বলে বুঝতে পারিনি। তবে আমাদের স্বামীজীর কথায় একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোমরাও এঁদের কথায় বিশ্বাস রেখে চলে যাও। কিছুই ভয় নেই। একটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। কত লোকে এ কথায় ভাওচি দেবে—"ও আবার ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ কি?" কারু কথা শুনবে না। জগৎ যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবু ছাড়বে না—যেটা পাকা করে ধরেছ।

প্রশ্ন—শুধু ধ্যান-জপ নিয়ে থাকা বড়ই কঠিন। আমি তো বেশি দিন পারলুম না।

মহারাজ—কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গেই করতে হয়। দু-চার বার পারিসনি বলেই পারবিনি কেন? বারবার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে শতবার পড়ে যায়, তবুও ছাড়ে না, শেষে দৌড়ুতে শেখে।"

প্রথমতঃ কর্মের মধ্যে থাকলে একটা training (গড়ন) হয়। তখন সেই মনকে সাধন-ভজনে লাগাতে পারা যায়। নইলে ভাসা-ভাসা রাখলে সাধন-ভজনের সময়ও সেইমত হয়। একটা সময় আসে যখন সব ছেড়ে শুধু জপ-ধ্যান নিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, তখন কাজ অমনি ছুটে যায়। মন যখন জাগ্রত হয়, তখনই এটা হয়। নতুবা জোর করে করতে গেলে দু-চার দিন ভাল লাগে, তারপরই আবার monotony (একঘেয়ে ভাব) আসে। কেউ কেউ হয়তো পাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাসাভাসা রকমে করে—আর দশটা জিনিসে মন থাকে।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা খুব শক্তি হয়। একটা লোক পঁচিশটা লোকের কাজ করতে পারে। আগেকার ব্রহ্মচর্যের নিয়মের মধ্যে কতকগুলি

নিয়ম ছিল—জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গ, এইসব। নিজের কিসে ভাল হবে সবাই কি জানতে পারে? সেইজন্য গুরু ও মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হয়। তোকে পুরো freedom (স্বাধীনতা) দিচ্ছি। কর দেখি, কয়দিন করতে পারিস? দু-চার দিন। মন এখন কাঁচা বলে, trained (নিয়ন্ত্রিত) নয় বলে যত গোল হচ্ছে। আড্ডার মতো শত্রু নেই। ওতে একেবারে ruin (অধঃপতন) এনে দেয়। নির্জনবাস না করলে মনের workings (ক্রিয়া) বুঝতে পারা যায় না—আর সত্য সব ধরতে পারা যায় না। নানা রকম হট্টগোলের মধ্যে থাকলে ভাবের development (বিকাশ) হওয়া ভারী শক্ত!

হিমালয়ের মতো জায়গা আছে? কি নির্জন, কেমন পবিত্র! শিবের স্থান—মাথা ঠাণ্ডা থাকে চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, নিজের নিজের ভাবে সকলে এগিয়ে যাক। যখন দেখি পারছে না, তখন help (সাহায্য) করি।

একটা জায়গায় ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ নিয়ে পড়ে থাকা সব রকমে ভাল। এমনি বেশি দিন থাকলে হয়তো তোরও মনে হতে পারে কিছু করি না, বসে বসে খাই—আর অন্য লোকও সে কথা বলতে পারে। একটা কাজ নিয়ে থাকলে মনও থাকে ভাল, শরীরও থাকে ভাল। আমরা যখন কাজ করতুম, তখন শরীরমন কেমন থাকত! লোকে মনে করে, এঁরা কিছুই কাজ করেন না—যেমন আমি, একটা স্থূল উদাহরণ হিসাবে বলছি; তেমনি আমরাও কাজ না করে থাকব না কেন? ও-রকম বুদ্ধি কখনো করিসনি। অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে। দু-চারটা জন্ম না হয় তাঁদের কাজে দিয়ে দিলি। ভুলও যদি হয়, না হয় দু-চার জন্ম গেলই। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের কৃপায় দেখিস হাউইয়ের মতো কোথায় উঠে যাবি! ওরকম

করে আলগা দিয়ে আর কাটাস নে। ল্যাদাড়ে হলে সাধন-ভজনও হবে না। যেটুকু করবি ষোল-আনা মন দিয়ে করবি—ওই হলো কাজের secret (কৌশল)। স্বামীজীও আমাদের এই কথা বলতেন। লেগে যা। একখানা কাগজ চালান তোদের পক্ষে কিছুই না। কাজ করবার সময় একবার তাঁদের প্রণাম করবি। আবার কাজ করতে করতে মাঝে interval (অবসর) পেলে তাঁদের স্মরণ-মনন করবি। কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি। তাঁদের কথা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের উপদেশ—এই সব চিন্তা করে দিন কাটাবি। মনে করিসনি যে এইসব নি—এর কাজ। ভাববি যে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ। নি—কিছু বললে মনে করবি যে বড় ভাই দুটো কথা বলেছে। সব এক পরিবারের লোক, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ব্যবহার হয় তেমনি করবি। নি—যেমন আমার আপনার, তুইও তাই। সেই রকম সব।

মনকে শান্ত করতে হবে। Inertia-র (জড়ত্বের) প্রশ্রয় না দিয়ে স্থিরভাবে মনকে প্রশান্ত করতে হবে। নতুবা reaction (প্রতিক্রিয়া) সামলান যায় না—ফল খারাপ হয়। জপ-ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই সংযত হয়ে আসে, কিন্তু প্রথমে উহাদিগকে বশে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। জপ-ধ্যান এক sitting-এ (আসনে) অনেকক্ষণ করবার শক্তি ক্রমশঃ হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার বসতে অভ্যাস করা ভাল। মন লাগুক, আর নাই লাগুক, জপ করে যাওয়া উচিত। কারণ, বসতে বসতে হয়তো মন আবার একাগ্র হলো। এইরূপ হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, ঐ শান্ত ভাবটার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও জপ-ধ্যান করে যাওয়া ভাল। কুণ্ডলিনী-চৈতন্য হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে থাকে! তখন মনেও হয় না যে, সেসব আছে।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

১৯২১

তোদের এত বলি কেন জানিস ? আমাদের যখন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কি না, তাই যেটা সামনে পায় সেটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছা গড়—সব জিনিসই তৈরি করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরি কর, তাকে ভেঙে ফেলে আবার অন্য জিনিস তৈরি কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়, কিন্তু ঐ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোনরকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধপবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোন ভাবনা নেই।

মন সরষের পুঁটলির মতো। সরষের পুঁটলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়বে তখন সেই মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও তেমন শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়ে নে। ঘুঁটি পাকা করে নে। এর পর বেশি বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সদ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে—কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার করে নিতে হবে। তারপর হবার আশা বড় কম। এখন শরীর-মন বেশ fresh (সতেজ) আছে। এই সময় একটা principle (উদ্দেশ্য) ঠিক করে নিয়ে খাটতে

হয়। এই বয়সে মনে যে ছাপ বদ্ধমূল হবে, সেইটি সারাজীবনের সম্বল হয়ে থাকবে।

এখন থেকে লেগে যা। এই বয়স থেকে খেটেখুটে যদি মনের একটা গড়ন করতে পারিস, তাঁকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে পারিস, তাঁতে ঠিক ঠিক মন লাগাতে পারিস—তাহলে এমন সুন্দরভাবে তোর জীবন গড়ে যাবে যে, কিছুতেই সংসারের দুঃখকষ্ট বা নিরানন্দ তোকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। কেবল আনন্দ, আনন্দ—অপার আনন্দের অধিকারী হবি।

মানুষ কি চায়?—আনন্দ। আনন্দ পাবার জন্য কত দৌড়াদৌড়ি করে, কত মতলব করে, কত চেষ্টা করে; তবু পায় কি? আনন্দ পাবে বলে নানারকম চেষ্টা ও মতলব করে একটা কিছু করলে—সেখানে ধাক্কা খেয়ে আবার একটা মতলব করে। এই রকম করে সারাজীবন কেটে যায়। আনন্দের অধিকারী হওয়া তার ভাগ্যে আর ঘটে না। সারাজীবন কুলির মতো বাজে খেটে, নানারকম দুঃখকষ্ট পেয়ে এ সংসার থেকে চলে যায়। শুধু আসা-যাওয়াই সার হয়। উদ্দেশ্য হারিয়ে মিছে সুখের পিছনে দৌড়ুলে এই অবস্থা ছাড়া অন্য আর কিছু আশা করা যায় না। আসল আনন্দ পেতে হলে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষণিক আনন্দের মায়া ত্যাগ করে তাঁতে ষোল-আনা মন দিতে হবে। তাঁর দিকে মন যত বেশি যাবে, আনন্দ তত বেশি হবে। আর সংসারের দিকে, ভোগের দিকে মন যত বেশি যাবে ততই দুঃখকষ্ট বেশি হবে।

মানুষের স্বভাব কি রকম জানিস? কেবল সুখ খোঁজে—মজা খোঁজে। ছোট-বড়, ধনি-নির্ধন সকলেই সুখের জন্য ছুটাছুটি করছে, কিন্তু গোড়ায় গলদ করে বসে আছে। আমার বিশ্বাস তাদের

মধ্যে 99 percent-এরও (শতকরা নিরানব্বই জনেরও) বেশি লোক জানে না আসল সুখ, আসল মজা কোথায়। তাই সামনে যা পায় তাই ধরে, আর মনে করে এটাই ঠিক। সেখানে ধাক্কা খায়, তখন আর একটাকে ধরে—আবার ধাক্কা খায়। কিন্তু দেখ, মজা এইখানে—বারবার ধাক্কা খাচ্ছে তবু রাস্তা বদলাবে না, ঠিক রাস্তা ধরবে না। ঠাকুর বেশ বলতেন, "উট কাঁটা ঘাস ছেড়ে ভাল ঘাস পেলেও খাবে না। জানে কাঁটা ঘাস খেলে মুখ কেটে রক্ত পড়বে, তবু তাই খাবে।" সৎসংস্কার, সৎস্বভাব, সদিচ্ছার culture-এর (অনুশীলনের) অভাবেই মানুষের এই অবস্থা। তোরা ছেলেমানুষ—দুনিয়ার ছাপ এখনো মনে কিছু পড়েনি। এই বেলা যদি উঠে-পড়ে লাগিস তাহলে দুঃখকষ্টের হাত থেকে এড়াতে পারিস।

ঐশ্বর্য যতই হউক না কেন, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যতই থাকুক না কেন, কিছুতেই স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না—পাঁচ-দশ মিনিট, বড়জোর আধ ঘণ্টা। জাগতিক কোন আনন্দই তার বেশি স্থায়ী হয় না। এই আনন্দের পর আবার নিরানন্দ আসে—ইংরেজীতে যাকে action and reaction (ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া) বলে। এমন আনন্দ চাই যার reaction হয় না। একমাত্র ভগবৎ-আনন্দের reaction নাই। এ ছাড়া যত রকম আনন্দের কথাই বল না কেন, সবেরই reaction আছে। reaction থাকলে দুঃখকষ্টও থাকবে।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভুলিস নে। পশুর মতো খেয়ে ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে কোনরকমে গোনা দিন কটা কাটিয়ে দেবার জন্য এ জীবন নয়। এই জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। মনুষ্যজীবন যখন পেয়েছিস, তখন পৃথিবীর সব ভোগ-সুখকে তুচ্ছ করে তাঁকে পাবার জন্য, সত্য উপলব্ধি করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প কর—প্রাণ

যাক আর থাক। তা যদি না করবি তবে ঠাকুরের নাম করে, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিস কেন? দুঃখকষ্টের হাত থেকে যদি নিস্তার পেতে চাস তো শরীর-মন সতেজ থাকতে থাকতে উদ্দেশ্যের দিকে দৌড় দে। কালে হবে, সময় হলে হবে, তাঁর কৃপা হলে হবে—এইভাবে নয়। ওসব তো কুড়েমির লক্ষণ। আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি নে। তার চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় বল, আমার ভোগ করবার ইচ্ছে আছে। মন-মুখ এক কর।

সময় আর কখন হবে? জীবনের best part (সব চেয়ে উত্তম সময়) চলে যাচ্ছে—ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর। এই সময়টা গোলমালে কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে ধর্ম করবি মনে করেছিস? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, নিজেকে ঠকান—একেই বলে।

স্থান—অদ্বৈতাশ্রম, কাশীধাম

১৯২১

অনেকে সারা জীবন গোলমালে কাটিয়ে পেনসন নিয়ে তীর্থবাস করে। তারা মনে করে তীর্থবাস করলে সারা জীবনের অশুভ কাজের যা-কিছু কুফল সব নষ্ট হয়ে যাবে ও মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ হবে। পাগল আর কাকে বলে? অবশ্য তীর্থস্থান পবিত্র স্থান—মনেপ্রাণে ঠিক ঠিক এই জ্ঞান যার আছে, তীর্থবাসের ফলে তার মনে কতকগুলি ভাল সংস্কার পড়বে এবং তার কিছু ফলও হবে, এই পর্যন্ত। তবে কাশীর কথা আলাদা। কাশীতে মরলে মুক্তি হয়, ইহা সত্য। বিশ্বনাথ বিশ্বের নাথ—তাঁর সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! সারা জীবন দুঃখকষ্ট পেয়ে মুক্ত হওয়া ভাল, না সারা জীবন সাধন-ভজনে ও ত্যাগ-তপস্যায় আনন্দে কাটিয়ে পরজীবনেও অপার

আনন্দের অধিকারী হওয়া ভাল? ঠাকুর যেমন বলতেন, "সদর দরজা দিয়েও বাড়ি ঢোকা যায়, আবার পায়খানার দরজা দিয়েও বাড়ি ঢোকা যায়।"—কোন্ রাস্তাটা ভাল? যখন চেষ্টা করলে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকা যায় তখন আর ময়লার গন্ধ শোঁকবার দরকার কি?

আর এক কথা—কৃপা। তাঁর কৃপা-বাতাস তো বইছে, পাল তুলে দে। ভোগবাসনা ও মানযশের ইচ্ছা দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাক। দুনিয়াও ভোগ করব আবার ভগবানও লাভ করব, তা কি কখনো হয়? দুটো এক সঙ্গে হতে পারে না। ভগবানকে চাস তো ভোগবাসনা ছাড়, আর ভোগ করতে চাস তো তাঁকে ছাড়তে হবে। দু-নৌকায় পা দিস নে—মহাকষ্ট পাবি। একটা পথ ঠিক কর।

এখন তোদের অল্প বয়স। এই সময় একটা রাস্তা ঠিক কর। এখন যদি রাস্তা ঠিক না হয়, কোন কালেও ঠিক হবে না। ভগবানকে আপনার থেকেও আপনার জেনে যে তাঁর জন্য এই জীবনে সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করেছে, তিনি তার অতি নিকটে। তার কাছে তিনি বাঁধা পড়েছেন—যশোদার কাছে, গোপীদের কাছে দুলাল শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঁধা পড়েছিলেন।

ঠাকুর বলতেন, "ভগবানের জন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে।" বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আবদার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর করে বলা যায়—দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তাঁর কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, কি সুখ, তা সে-ই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয়—আলুনী লাগে। তিনি আরও বলতেন, "যারা তাঁর জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ

করেছে, তারা বার-আনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।" দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তাঁর অনেক কৃপা থাকলে, পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরি করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন-কাটান বড় শক্ত। এখন ছেলে-মানুষ বলে যত সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জানিস?—খোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ছাড়া এ রাস্তায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ-বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে more than 99 per cent (শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশি) লোক ভোগের পিছনে দৌড়ুচ্ছে, এইসব নিত্য দেখতে হবে—এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা। এইসব ছাপ যদি একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নাই। যারা ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করতে চায়, তাদের সদাসর্বদা নিজের মনকে সদ্বিষয়ে engage (নিযুক্ত) করে রাখতে হবে। সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সদ্বিষয় আলোচনা, ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ ও জপ-ধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরি করা যেতে পারে।

প্রথম ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা পাকা করে নে—বাকি সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করলে ব্রহ্মচর্য রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবানলাভ হয়। ভগবানলাভ না হলে মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সদ্বুদ্ধি সৎমন তোদের—একটু চেষ্টা কর, অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।

স্থান—ভদ্রক

১৯১৫

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও মানুষ যখন তার সদ্ব্যবহার না করে, ভগবানের পাদপদ্মে মন না দিয়ে অসার মায়ামোহের সমুদ্রে ডুবে থেকে মনে করে 'বেশ আছি', তখন তিনিও বলেন, 'বেশ থাক'। আবার যখন দুঃখকষ্ট পেয়ে হায় হায় করে ভাবে 'এ জীবনে করলুম কি'? তখন তিনিও বলেন, 'করলি কি'? মানুষ কল্পতরুর নিচে বসে আছে, তার কাছে যা চাবে তাই পাবে, দেবত্ব চাও দেবত্ব পাবে, পশুত্ব চাও পশুত্ব পাবে।

মানুষকে তিনি দুটি জিনিস দিয়েছেন—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা দুরকম—বিবেক ও বৈরাগ্য। এদের আশ্রয় নিলে মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হয়। অবিদ্যা ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি। এদের আশ্রয় নিলে মানুষ পশুভাবাপন্ন হয়। বিদ্যার culture (অনুশীলন) করলে অবিদ্যার নাশ হয়, আবার অবিদ্যার culture করলে 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান বেড়ে গিয়ে মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে রাখে, ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা পেতে হয়। তিনি জীবকে বিদ্যা ও অবিদ্যা শুধু এই দুইটি জিনিসই দিয়েছেন, তা নয়—এ দুটির মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করে নেবার শক্তিও আবার দিয়েছেন। মানুষ যেটি ভাল মনে করে সেটি নেবে, ফলও সেই রকম পাবে।

মানুষ দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাঁকে যে দোষ দেয় সেটা ভুল, মস্ত ভুল। তুমি নিজের পছন্দমত রাস্তা ঠিক করে নিয়ে তার ভালমন্দ

ফলভোগ করছ। তার জন্য তাঁকে দোষ দিলে চলবে কেন ? ক্ষণিক সুখের মোহে এত ভুলে গেলে যে, ভালমন্দ বিচার করে দেখবার তোমার আর সময় হলো না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই—সেটা আগুনের দোষ না তোমার দোষ ? ঠাকুর বলতেন, "প্রদীপের স্বভাব আলো দেওয়া, কেউ বা তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ বা তাতে জাল জুয়াচুরি করছে, আবার কেউ বা তাতে ভাগবত পাঠ করছে—সে কি আলোর দোষ ?" সেই রকম ভগবান মানুষকে ভালমন্দ দুটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তোমার ইচ্ছামত select (পছন্দ) করে নাও।

যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ হবে। বিবেক-বৈরাগ্য আশ্রয় কর, তাঁকে লাভ করে আনন্দের অধিকারী হবে—আর সংসারকে আশ্রয় কর, এ জীবনে অল্পবিস্তর ক্ষণিক আনন্দ পাবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে অনন্ত দুঃখকষ্ট পাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কেবল সুখটি চাই, দুঃখটি চাই না, বললে চলবে না। একটাকে চাইলে আর একটা আসবেই, তুমি চাও আর নাই চাও।

ঠাকুর বলতেন, "মলয়ের হাওয়া লাগলে যেসব গাছে সার আছে সেসব গাছ চন্দন হয়, কিন্তু অসার গাছ, যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি, কিছুই হয় না।" মানুষের মধ্যে দুই রকম মানুষ আছে। এক রকম আছে, তাদের সৎকথা শুনলেই বিবেক বৈরাগ্য জেগে ওঠে, সংসার-সুখকে তুচ্ছ বোধ হয় এবং তাঁর কৃপাকণা পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। তাঁকে জানবার জন্য, জীবন-মরণের রহস্য ভেদ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এমনকি এই শরীরটা থাক বা যাক তাতে ক্ষতি নেই—তাঁকে লাভ করতে হবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে, এই রকম জিদ করে ভজন শুরু করে দেয়। এরা জীবনে successfulও (সফলকাম) হয়। আর এক রকম

লোক আছে, তাদের সামনে যত বড় আদর্শই ধর না কেন কিছুতেই হুঁশ হয় না। তারা মনে করে—"এ সংসারে চিরদিন বেঁচে থাকব, আমি না থাকলে চলবে না, হাতের কাছে যা পেয়েছি তা ভোগ না করলে আহাম্মকি হবে।" এইভাবে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকার কূপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

চন্দনের গন্ধ enjoy (উপভোগ) করা ভাল না দুর্গন্ধ ভোগ করা ভাল ? শান্তি ভাল না অশান্তি ভাল ?—এটা বেশ করে বুঝ ; বুঝে একটা রাস্তা ঠিক কর। সময় তোমার জন্য দাঁড়াবে না, নদীর স্রোতের মতো হু হু করে চলে যাচ্ছে। পরে হায় হায় করলে কোন ফল হবে না। যে সময়টা চলে গেছে তা ফিরে পাবার কোন উপায় নেই, তার জন্য ভেবেও কোন লাভ নেই। যে সময়টা এখনো তোমার হাতের মধ্যে রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার কর। আর এক মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়। মনটাকে এখন থেকে এমন ভাবে গড় যে, তাঁর চিন্তা, তাঁর স্মরণ-মনন ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মনে যেন আর স্থান না পায়। গোনা দিন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে, গোলমালে আর কাটিও না।

আকুল প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, "হে প্রভু, আমায় সদ্বুদ্ধি দাও, আমাকে তোমার আপনার করে নাও। 'আমি' 'আমার' ভাব দূর করে দাও। 'আমি' 'আমার' বলতে বলতে অনেক ধাক্কা খেয়েছি—'তুমি' 'তোমার' বলতে শেখাও।" দেখছ না চোখ বুজলে তোমার বলে কিছু থাকে কি ? আমার বলে যেগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছ সেগুলো কি তোমার সঙ্গে যাবে ? তারা তাদের সময় হলে যে যার মতো চলে যাবে, তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তোমাকে ওসব ফেলে কোন এক অজানা দেশে চলে যেতে হবে। যতই 'আমার' 'আমার' করবে, ততই পায়ে বেড়ি পড়বে। এই যে 'সংসার' 'সংসার' করে মানুষ মরে, এতে আছে কি ? যখন ধাক্কা

খাবে তখন কি তারা রক্ষা করতে পারবে ? যে জন্য এখানে আসা, যে জন্য এদুর্লভ মনুষ্যজন্ম, সে বিষয়ে কিছু না করে, সেটিকে বাকি রেখে এখান থেকে যদি যেতে হয়, তাহলে এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে ? এরূপভাবে যাতে যেতে না হয়, তার জন্য উঠে পড়ে চেষ্টা কর ; তাঁর কাছে খুব করে কাঁদ, আকুল প্রাণে তাঁকে ডাক ।

শুনেছ তো ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কি রকম করে কাঁদতেন ?—"মা, আর একটা দিন কেটে গেল, এখনো দেখা দিলিনি !" তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, কি ছার সংসার, কেবল দুঃখের আগার । এখানে তো কেঁদে কেঁদে দিন কাটল, সেখানেও কি কেঁদে কেঁদে দিন কাটবে ?

ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ, তখন তাঁর কৃপা নিশ্চয় পেয়েছ জানবে । তাঁর কৃপার সদ্ব্যবহার কর । কৃপাময়ের কৃপা পেয়ে যদি ধারণা করতে না পার, আনন্দ না পাও, জীবনমরণের রহস্য ভেদ করে তাঁর নিত্যসঙ্গী হতে না পার, তাহলে তোমার মতো হতভাগা এ জগতে আর কে আছে ? এ যুগের মানুষ তোমরা—যুগের হাওয়া গায়ে লেগেছে, তার advantage (সুযোগ) নিতে ছেড় না । এত সোজা ও সহজভাবে রাস্তার খবর কোন যুগে কেউ বলেনি—এ opportunity (সুবিধা) যদি হেলায় হারাও তবে অনেক কাল ভুগতে হবে ।

যুগের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে হু হু করে এগিয়ে যাও । তিনি অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় পৌঁছে যাবে । পাল তোল, পাল তোল । শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে । নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় দুর্বলতা থাকতে পারে না ; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে । পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও—তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে ।

স্থান—শশী নিকেতন, পুরী

১৯১৫

অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করব। আমার মনে হয় এ ভাবটি ইংরেজী শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনো সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনো বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন দেশের ও দশের মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বলতেন, "বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, আগে খুঁটি পাকড়াও।" অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা। আগে তাঁকে জানতে হবে, তাঁর পদে বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় করতে হবে, তারপর অন্য যে কোন কাজ করতে হয় কর। তাঁকে জেনে কর্ম করলে নিজের প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, অপরকেও শান্তি দেওয়া যায়।

ঠাকুর বলতেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" যদি আমরা তাঁর ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তাহলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে—কোন দাগ থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তখনই আমরা তাঁর ভক্ত, পুত্র, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী।

শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোনরকম ময়লা ধরেনি, এখন

থেকে তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্য কোন জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতে হবে —এ জীবনে।

কেবল পড়াশুনা করে কি হবে? বি-এ, এম-এ পাস করে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিলে কিংবা ব্যারিস্টার হয়ে টাকা রোজগার করলেই সব হয়ে গেল না। এতে মনের ক্ষণিক আনন্দ হবে এই পর্যন্ত। কিন্তু যে জন্য এ জগতে আসা, যে জন্য এই মনুষ্যজীবন, সে বিষয়ে কোন সাহায্য হবে না—অবশ্য আমি কাউকে মূর্খ হতে বলছি নে। মূর্খের ধর্ম হয় না—বড় ভাব ধারণা করতে পারে না। যারা ইহকালে ভোগসুখ চায় তারা বি-এ, এম-এ পাস করুক, টাকা রোজগারের সুবিধা হবে। কিন্তু যারা অনন্ত সুখ চায় তাদের বেশি ডিগ্রির দরকার নেই। ডিগ্রি নেবার জন্য পড়াশুনায় যে সময় কাটে তার বার ভাগের এক ভাগ সময় যদি সদ্‌গ্রন্থ-পাঠে দেওয়া যায়, তাহলে অনেক ভাল ভাব ভেতরে আসে। ঠাকুর বলতেন, "গ্রন্থ নয় গ্রন্থি" অর্থাৎ গাঁট। উহাতে বন্ধন হয়। তবে সদ্‌গ্রন্থসম্বন্ধে সে কথা খাটে না—যেমন গীতাদি শাস্ত্র এবং ঠাকুর-স্বামীজীর বই। এ ছাড়া আর যে কোন বই পড় না কেন, তাতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়বে এবং ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। যে সব গ্রন্থ পাঠ করলে ভগবানে ভক্তি-ভালবাসা আসে না, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয় না, তা বর্তমানে ভাল বোধ হলেও আখেরে অমঙ্গলের কারণ হয়। বাবা, মানুষ যদি হতে চাও, যদি নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে তাঁর নামে ডুবে যাও! ভাসা ভাসা নয়—একেবারে ডুব। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন, এই মূল মন্ত্র কর।

আবার টাকা হওয়ারও ঐ দোষ। টাকা ভাল অপেক্ষা মন্দই বেশি করে। টাকা থেকেই জগতে বেশি অনর্থ হয়। ঠাকুর টাকা

ছুঁতে পারতেন না—জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায়। তিনি এবার এসে জীবন দিয়ে দেখালেন, ত্যাগই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ে পশু হতে চলেছে। যদি মনুষ্য পদবীতে থাকতে ইচ্ছা হয়, তবে ত্যাগকে আশ্রয় কর, ভগবানকে আশ্রয় কর, তাঁকে জান। ক্ষণিক আনন্দের আশা ত্যাগ করে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হও।

ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবনে দেখছ না ত্যাগ করা মানে কি? হে জীব, ভোগবাসনা ত্যাগ কর, তাঁর পাদপদ্মে শরণ লও, 'মান হুঁশ' হও।

ত্যাগ—একমাত্র ত্যাগই শান্তি দিতে পারে। তার জন্য সব ত্যাগ কর। তাঁকেই একমাত্র আপনার কর। তুমি পিতা মাতা, বন্ধু ভ্রাতা, তুমিই সব—এই ভাব। তখনই আমরা প্রকৃত মানুষ হব, প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হব, যখন পৃথিবীর এই সমস্ত ভোগ-সুখ ত্যাগ করে তাঁর চিন্তা, তাঁর স্মরণ-মনন নিয়ে আমাদের সব সময় কাটবে। সে যে কি আনন্দ তা মুখে বলা যায় না! সে অবস্থা না হলে বলে বোঝান যায় না।

ভগবানলাভের জন্য তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য-জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা, তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপায় মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মটা বৃথা না যায়। কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর একটা কথা মনে রেখো—মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসনা পরজীবনে আবার হয়তো আসবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির

ভিতর এসে পড়েছ, দেখো যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস যদি না থাকে, শুধু মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না। বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার হবে করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশি ভাবেন। ষোল-আনা তাঁতে নির্ভর কর, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু-আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবানলাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না, ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা যদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন।

ত্যাগ ব্যতীত শান্তি পাওয়া যায় না। ত্যাগ চাই। ভগবানের জন্য, শান্তির জন্য, নিজের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ চাই। পশু প্রবৃত্তির দাস—মানুষ তা নয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই ভগবানলাভ করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে। সব ছেড়ে তাঁকে জোর করে ধর।

ত্যাগ মানে নাগাদের মতো গায়ে ছাই মেখে, চিমটে হাতে করে বেড়ান নয়। বাইরে লোকদেখান ত্যাগের কোন দাম নেই, কোন

লাভ নেই ; বরং তাতে অপকার আছে। সে-ই ঠিক ঠিক ত্যাগী যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে দিয়ে দিয়েছে—আমার বলতে কিছু রাখেনি। আমার দেহ, মন, বুদ্ধি সব তোমায় দিলাম, যা ইচ্ছা কর—তোমার জিনিস তুমি ইচ্ছামত ব্যবহার কর—এই ভাব। শোননি, ঠাকুর মা ছাড়া কিছু জানতেন না। যা করেন মা। মার ইচ্ছা ব্যতীত নিজের কোন ইচ্ছা ছিল না। সর্বদা তাঁকে জানাবে—হে প্রভু, আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি নে, বুঝি নে, আমি তোমার—যা ভাল বোঝ কর। এই ভাবটি জোর করে ধরে রাখবে। তোমার যখন যা দরকার তিনি বুঝবেন, তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক।

আর একটি বিষয়ে খেয়াল রাখবে। ভগবানের কৃপায় যখন তাঁকে লাভ করা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলে বুঝেছ, তখন সকলে ভালই বলুক বা মন্দই বলুক, সুখ্যাতিই করুক আর অখ্যাতিই করুক, দুনিয়া স্থান দিক বা না দিক, শরীর থাক বা যাক, নিজের principle (আদর্শ) থেকে এক ইঞ্চিও হঠবে না। এই জীবনেই ভগবানলাভ করতে হবে, তার জন্য যত দুঃখকষ্ট আসে সহ্য করতে হবে। এইভাবে যদি জীবন গড়তে পার, তবেই তুমি মানুষ, তাহলেই তুমি ঠাকুরের নাম নেবার অধিকারী, তাহলেই তোমার সাধুসঙ্গ সার্থক। তা যদি না পার তবে বুঝব তুমি দু-হাত-পা-বিশিষ্ট একটা জানোয়ার মাত্র।

আর একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখছি—গুরু বলতে আমরা কি বুঝি। যে কেহ বীজ-সংযুক্ত করে কানে মন্ত্র দেন, সাধারণতঃ তাঁকেই গুরু বলা যায়। সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কারও গুরু হবার অধিকার নেই। যাঁর নিজের রাস্তার খবর জানা নেই তিনি অপরকে রাস্তা দেখাবেন কেমন করে? অবশ্য মন্ত্রশক্তি সমান

ভাবেই রয়েছে। কিন্তু বিধি ঠিকমত জানা না থাকায় গুরু-শিষ্য উভয়েরই ঠিক ঠিক উন্নতি হয় না। এজন্যই শিষ্য প্রাণে শান্তি পায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে এবার রাস্তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। অমূল্য রত্ন এঁদের (ঠাকুরের শিষ্যদের) ভাণ্ডারে রয়েছে। যে কেউ সৎ, বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হবে তাকে এখানে আসতেই হবে। অন্য কোথাও শান্তি নেই; এঁদের কাছ থেকে যে যা পেয়েছে, তাতে যদি বিশ্বাস করে নিজের নিজের জীবন গড়ে চলে যায়, সে নিশ্চয়ই অপার আনন্দের অধিকারী হবে, মনুষ্যত্ব লাভ করবে। এঁরা এ যুগের ভাবে ভাবুক, এ যুগে কি রকম ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া দরকার, এঁরা ভাল জানেন। যার যে ভাবে উন্নতি হবে তাকে সে ভাবেই উপদেশ দেন। কাউকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়েছেন, কাউকে উপদেশ-চ্ছলে দীক্ষা দিয়েছেন, কাউকেও বা স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন। যার ভাগ্যে যেরূপ জুটেছে সে সেটি বিশ্বাস করে রাস্তা চলুক, সরল প্রাণে গুরুর কাছে প্রার্থনা করুক, বাকি যা দরকার তিনি দেবেন—তিনি নরশরীরে থাকুন বা নাই থাকুন। শিষ্যের জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গুরু যিনি, তিনি শিষ্যকে পথ দেখাবার জন্য, তার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন। শিষ্যের জন্য গুরু মধ্যে মধ্যে স্থূল ভাবে প্রকাশ হন।

খাট, খাট। সন্দেহ ছেড়ে দিয়ে যা পেয়েছ সেটি জীবনে ফলাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও। ঢাক ঢোল পিটে নয়—অতি গোপনে, লোকে যেন টের না পায়। নানারকম লোক আছে। কেউ নানা কথা বলে ঠাট্টা করে ভাব নষ্ট করে দেয়, আবার কেউ বা সুখ্যাতি করে অহঙ্কার বাড়িয়ে দেয়। ঠাকুরের সেই কথাটি মনে রেখ—"ধ্যান করবে মনে, বনে, আর কোণে।" অর্থাৎ সাধন-ভজন, স্মরণ-মনন যথাসম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে করবার চেষ্টা করবে। কিছুদিন বেশ করে খেটে ভজন কর, দেখবে কি মজা, কি আনন্দ! দেখবে তুমি

নূতন মানুষ হয়ে গেছ। যখন বের হয়ে এসেছ তখন মূলমন্ত্র কর—তাঁকে লাভ করবই করব এ জীবনে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছ, ভাবনা কি? হবেই হবে।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

২৩ জানুয়ারি, ১৯১৮

বেলা ৭টা। মহারাজের ঘরে স্তবপাঠ হচ্ছে। মহারাজ স্থির হয়ে বসে নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। প্রথমে গুরুস্তব পাঠ হবার পর জগদ্ধাত্রী ও কালিকাস্তবপাঠ হলো।

গুরুস্তব—

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙিঘ্র পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং তত কিং ততঃ কিম্॥

জগদ্ধাত্রীধ্যান—

ওঁ সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥ ইত্যাদি

জগদ্ধাত্রীস্তব—

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥ ইত্যাদি

দক্ষিণাকালিকাধ্যান—

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্ ।
অভয়াং বরদাঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ পাণিকাম্ ।। ইত্যাদি

স্তবপাঠ শেষ হবার কিছুক্ষণ বাদে রামলাল দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) দক্ষিণেশ্বর থেকে এলেন । তাঁকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করবার পর মহারাজ দক্ষিণদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তসম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেন । কাঞ্চি, শ্রীরঙ্গম, কন্যাকুমারী প্রভৃতি তীর্থস্থানের দেব-দেবীর মূর্তি, তথাকার লোকদের আচার-ব্যবহার ও শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রাচীন মন্দিরসমূহের উত্তম কারুকার্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন ।

কথাপ্রসঙ্গে আবার বললেন, দক্ষিণদেশে অনেক লোক পেটের দায়ে এবং উচ্চ জাতির ঘৃণা পেয়ে ধর্মান্তরগ্রহণ করেছে । আমার ইচ্ছা হয়, গঙ্গাজল এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে তাদের আবার হিন্দু-পদবীতে তুলে নেই ।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

২৪ জানুয়ারি, ১৯১৮

সকাল ৭টা । মহারাজ একজন সাধুকে স্তবপাঠ করতে বললেন । প্রথম কালিকাস্তব এবং পরে ত্রিপুরসুন্দরীর স্তবপাঠ শেষ হলে মহারাজ 'নবীননীরদ' গোপালের এই স্তবটি পাঠ করতে বললেন ।

ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব—

কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্বকাদম্বিনীং ।
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনীসেবিতাম্ ।। ইত্যাদি

গোপালস্তোত্র—

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ইত্যাদি

রামলাল দাদা কাল থেকে বলরাম মন্দিরে আছেন। তিনি সকালে মহারাজের ঘরে বসে স্তবপাঠ শুনছিলেন। স্তবপাঠ শেষ হবার পরে মহারাজ রামলাল দাদাকে একটি গান গাইতে বললেন। রামলাল দাদা মধুরকণ্ঠে গান ধরলেন। এই গানটি ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল। রামলাল দাদা বহুবার ঠাকুরকে এই গানটি শুনিয়েছেন।

বলরে শ্রীদুর্গানাম।
(ওরে আমার, আমার মন।)

নমো নমো নমো গৌরি, নমো নারায়ণি।
দুঃখী দাসে কর দয়া, তবে গুণ জানি ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা, তুমি গো যামিনী।
কখনও পুরুষ হও মা, কখনও কামিনী ॥
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশি।
ভুলালি শিবের মন মা, হয়ে এলোকেশী ॥
দশমহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর পার ॥
যশোদা পূজেছিল মা, জবাবিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি, কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশিদিন থাকে যেন মন ও রাঙা চরণে ॥
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গাবলে ডাকে ॥

যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে ।
সুধামাখা তারানাম মা, আর কার আছে ।।
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব ।
বাজন নূপুর হয়ে মা, তোমার চরণে বাজিব ।।
যখন বসিবে মাগো, শিব সন্নিধানে ।
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে ।।
চরণে লিখিতে নাম, আঁচড়ে যদি যায় ।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ।।
শঙ্করী হয়ে মাগো, গগনে উড়িবে ।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ।।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ি, যখন যাবে পরাণী ।
কৃপা করে দিও মাগো রাঙ্গা চরণ দুখানি ।।
পার কর ওমা কালী, কালের কামিনী ।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী ।।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল ।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল ।।
গোলোকে সর্বমঙ্গলা মা, ব্রজে কাত্যায়নী ।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা, অনন্ত রূপিণী ।।
দুর্গা দুর্গা বলে যেবা পথে চলে যায় ।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ।।

পরে আর একটি গান গাইলেন ঃ

কে রণে নেমেছে বামা নীরদবরণী ।
শোণিত-সায়রে যেন ভাসিয়ে নীলনলিনী ।।

কে রে ঘূর্ণিতলোচনা ত্রিনয়নী দিগম্বরী,
পদভরে ধরাধর অধীরা ধরণী।
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপাণি॥

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

৩০ জানুয়ারি, ১৯১৮

রবিবার সকাল ৭টা। মহারাজ ছোট ঘরটিতে স্থিরভাবে চুপ করে বসে আছেন। সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ একে একে এসে প্রণাম করে বসল। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন, খুব সকাল সকাল উঠা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে—এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি বেশ শান্ত থাকে—উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিঃশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীরা সর্বদা watch (নজর) রাখেন কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।

মনকে দুই উপায়ে স্থির করতে হয়। প্রথম কোন নির্জন স্থানে গিয়ে মনকে সঙ্কল্প-বিকল্পাদি রহিত করে ধ্যান-ধারণা করা। দ্বিতীয়, ভাল ভাল thought (বিষয়) নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনকে develop (উন্নত) করা। গরুকে খাওয়ালে যেমন দুধ দেয়, মনকে সেইরূপ food (খাদ্য) দিতে হয়, তবেই মন শান্ত থাকে। মনের food হচ্ছে ধ্যানজপ, সৎচিন্তা ইত্যাদি।

অনেক সাধক আছেন, তাঁরা মনকে ছেড়ে দেন এবং বসে বসে

শুধু watch (লক্ষ্য) করেন, মন কি করছে। শেষে মন ঘুরে ঘুরে যখন কিছুতেই শান্তি পায় না তখন আপনা থেকেই ভগবানের দিকে যায়, তাঁর শরণাপন্ন হয়। তুমি যদি মনকে দেখ, মন তোমায় নিশ্চয়ই দেখবে। অতএব সদাসর্বদা মনকে watch (লক্ষ্য) করতে হয়। সাধনার পক্ষে নির্জন স্থান খুব ভাল। তাই মুনি-ঋষিরা হিমালয় ও গঙ্গাতীর select (পছন্দ) করতেন।

মনের আসক্তিত্যাগই ত্যাগ। হাজার জিনিস আসুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। আবার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার দ্বারা মনটাকে transparent (নির্মল) করতে হয়, তা না হলে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। Struggle, struggle (চেষ্টা, চেষ্টা)। Struggle (চেষ্টা) করবার প্রবৃত্তি যার আসেনি সে তো lifeless (মৃত)। বুক পেতে এই struggle (চেষ্টা) বরণ করে নিলে তাঁর next step (পরের অবস্থা) শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন— সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে। বাহিরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান, পরান এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারাদি করা, মনোরাজ্যেও যখন এইরূপ হবে অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন ভগবানকে খাওয়ান পরান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারাদি হবে তখনই শান্তি।

তাঁর কার্য কি বুঝা যায়? অনন্ত অথচ সান্ত। মানুষেও তিনি আসেন। কাকভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা করে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কৃপায় তাঁকে ভগবান বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনো সুগম পথ দিয়ে, কখনো কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনো দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে

নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া, আর কোন উপায় নেই।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

প্রশ্ন—মহারাজ, সেদিন বলেছিলেন, মনকে দুই উপায়ে স্থির করতে হয়। আমি কোন্ উপায়ে করব ?

উত্তর—মনকে জোর করে ইষ্টপাদপদ্মে ধরে রাখবি।

প্রশ্ন—কোন্ স্থানে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করব, মস্তকে না হৃদয়ে ?

উত্তর—হৃদয়ে ধ্যান করবি।

প্রশ্ন—হৃদয়ে কি রকম ধ্যান করব?

উত্তরে মহারাজ কি রকম ভাবে বসতে হবে এবং কেমন করে হৃদয়ে চিন্তা করতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন—হৃদয়েতে হাড়-মাংস ইত্যাদি আছে। সেখানে ইষ্টমূর্তি কি করে চিন্তা করব ?

উত্তর—হাড়-মাংসের কথা চিন্তাই করবি না। ঠিক হৃদয় স্থানটিতে তিনি রয়েছেন—এইভাবে চিন্তা করবি। প্রথমে দুই একবার হাড়-মাংসের কথা মনে হলেও পরে আর মনে থাকবে না—কেবল ইষ্টমূর্তিই থাকবে।

প্রশ্ন—ইষ্টমূর্তি পট এবং প্রতিমায় যেমন আছে ঠিক সেই রকমই ভাবব তো ?

উত্তর—সেই আকার বটে তবে জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় ভাববি।

প্রশ্ন—শুনেছি, মন্ত্রার্থ চিন্তা করে জপ করতে হয়। মন্ত্রটি কি প্রত্যেক অক্ষর ধরে চিন্তা করতে হয়, না সমগ্র মন্ত্রটি একসঙ্গে চিন্তা করতে হয় ?

উত্তর—মন্ত্রার্থ কি রকম জানিস ? যেমন নাম ধরে ডাকা। তোর নাম অমুক। তোর নাম ধরে ডাকলে তোর রূপটিও আমার মনে জাগবে। সেই রকম মন্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার রূপ অর্থাৎ ইষ্টমূর্তি ধ্যান করতে হবে।

প্রশ্ন—জপ কি শব্দ করে করতে হবে, না মনে মনে ?

উত্তর—যখন একলা নির্জনে জপ করবি তখন তুই নিজের কানে যেন শুনতে পাস এই রকম ভাবে করবি। আর লোকজন কাছে থাকলে মনে মনে জপ করবি।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

জপ করতে বসলে মন্ত্রটি জ্যোতির অক্ষরে কপালের কাছে জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে। স্পষ্ট দেখতে পাই যেন জ্যোতিঃ দিয়ে লেখা। এ দেখার পর ইষ্টমূর্তি আর দেখতে পাই না। ঐ মন্ত্রটিকেই কেবল দেখি।

উত্তর—উহা খুব ভাল ও শুভ লক্ষণ। দুই-ই দেখতে হবে। মন্ত্র নামব্রহ্ম। মন্ত্রটিও দেখবি, ইষ্টমূর্তিও দেখতে চেষ্টা করবি।

প্রশ্ন—ইষ্টধ্যান প্রথমে মুখ হতে আরম্ভ করব কি ?

উত্তর—প্রথম শ্রীচরণ বন্দনা করে শ্রীচরণ হতে আরম্ভ করবি। পরে মুখ, হাত, পা যা আসে আসুক।

প্রশ্ন—অত বড় মন্ত্রের কি দরকার?

উত্তর—হাঁ, ও রকম দরকার। মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে—খুব জপ করবি।

প্রশ্ন—অনেকে বলে জপের সময় মালায় তর্জনী লাগলে অপরাধ হয়।

তুই কি তর্জনী দিয়ে জপ করিস? তর্জনী দিয়ে জপ না করাই ভাল। তবে তোর যদি অসুবিধা হয়, তর্জনী দিয়ে জপ করতে পারিস—তাতে দোষ হবে না।

প্রশ্ন—মন কি করে স্থির করব?

উত্তর—প্রত্যহ ধ্যান-অভ্যাস করা দরকার। ভোরবেলা ধ্যানের খুব প্রশস্ত সময়। ধ্যানের পূর্বে একটু শাস্ত্রাদি পাঠ করে নিলে মন সহজেই একাগ্র হয়। ধ্যানের পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকা দরকার। কারণ, ধ্যান করবার সময় তার effect (ফল) নাও হতে পারে; পরেও হতে পারে। সেইজন্য ধ্যান ছেড়েই অন্য কোন সাংসারিক বিষয়ে বা বাজে বিষয়ে মন নিয়োজিত করলে বড় ক্ষতি হয়।

ধ্যানজপ অভ্যাস করা প্রথম প্রথম বিশেষ দরকার। যদি ভাল নাও লাগে তবু নিত্য অভ্যাস করতে হবে। শুধু অভ্যাসে অনেক কাজ হয়। রোজ অন্ততঃ দুই ঘণ্টা জপ করা দরকার। কোন নির্জন বাগানে, নদীতীরে, বড় মাঠের ধারে অথবা নিজের ঘরে একলা চুপ করে বসে থাকলেও অনেক সময় কাজ হয়। প্রথম প্রথম একটা routine (নিয়মিত কার্যপদ্ধতি) করে কাজ আরম্ভ করা উচিত। এমন কোন কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় যাতে routine-টি (নিয়মিত কার্যপদ্ধতি) ভেঙে যায়।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

প্রশ্ন—ইষ্টমূর্তি ধ্যান করতে গেলে যদি অন্য দেবদেবীর মূর্তি আসে তখন কি করব ?

উত্তর—এ খুব ভাল, জানবি। আমার ইষ্টই নানা দেবদেবীর মূর্তিতে আমার কাছে আসছেন, এইরূপ ভাববি। তিনি এক, আবার তিনিই বহু। নিজের ইষ্টমূর্তিকেও দেখবি, আবার অন্যরূপে যিনি আসেন তাঁকেও দেখবি। কিছুদিন পরে দেখতে পাবি ইষ্টতেই সব লয় হয়ে যাবেন।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে এবং কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও দুর্গাপূজাতে যথানিয়মে খুব বেশি করে জপধ্যান করবি। সকল স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখবি। কাহাকেও কোন কথা দিলে যে করেই হোক সে কথা রাখবি। যদি সন্দেহ হয় রাখতে পারবিনি, তাহলে বলবি, চেষ্টা করব।

প্রশ্ন—শুনেছি জপধ্যান করবার আগে গুরুপূজা করে নিতে হয়। আমি তো সেইসব কিছুই জানি না।

উত্তর—প্রথমে ইষ্টের মতোই হৃদয়ে গুরুর ধ্যান করে নিতে হয়। পরে গুরু ও ইষ্ট এক, এইরূপ ভাবনা করে গুরুকে ইষ্টতে লয় করে দিয়ে তখন ইষ্টের ধ্যান বা জপ আরম্ভ করতে হয়।

স্থান—বলরাম মন্দির, কলিকাতা

২১ জুন, ১৯১৮

বুধবার, বেলা আন্দাজ ৯টা। মহারাজ হলঘরে পায়চারি করছিলেন, এমন সময় ঢাকা থেকে জনৈক ভক্ত এসে প্রণাম করলে।

মহারাজ তাকে কুশল প্রশ্নাদি করে ঢাকা মঠের এবং তথাকার ভক্তদের কে কেমন আছে ইত্যাদি বিষয়ে খবর নিলেন। একটু পরে বাগবাজারের চুনীবাবু (ঠাকুর যাঁকে নারায়ণ বলে ডাকতেন) এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বললেন, "মায়াতে মনপ্রাণ সব low (নীচু) করে রাখে।" ঠাকুর বলতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" আগে খেটেখুটে বুড়ি ছুঁয়ে রাখলে শেষে দশ হাজার সংসার করলেও কিছু করতে পারে না।

মায়াবদ্ধ জীব বুঝে না যে, এ জগতে দেহধারণ করা বড় কষ্ট। মানুষের এই শরীর কিছুই নয়—দিন দিন decay (ক্ষয়) হচ্ছে, তবু হুঁশ নেই, মায়া-মোহে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বার বার জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছে। দেহধারণ খুবই কষ্ট, কিন্তু এই মনুষ্যজীবনেই ভগবানলাভ হয়। সুতরাং এমন কাজ করতে হবে যাতে আর না জন্মাতে হয়। যে কোন উপায়ে তাঁকে লাভ করে এই জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতে হবে।

প্রশ্ন—মহারাজ, নিরাকার-ধ্যান কি করে হয়?

উত্তর—খুব advanced (উন্নত) না হলে নিরাকার-ধ্যান হয় না। আগে স্থূল, তারপর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পর কারণ, তারপর মহাকারণে লয়।

স্থান—রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া

আগস্ট, ১৯১৮

মহারাজ নিচে বৈঠকখানায় বসে আছেন। কলকাতা থেকে একটি যুবক এসে প্রণাম করে বসল। মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের Students' Home-এর (ছাত্র-নিবাসের) কাজকর্ম কি রকম চলছে?

উত্তর—ভাল নয়, নানারকম গোলমাল।

যুবকের কথা শুনে মহারাজ বললেন—"আমাকে পূর্বে ওসব বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিসনি কেন ?"

মহারাজের কথা শুনে যুবকটি আর কোন জবাব না দিয়ে, দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে বিষণ্ণবদনে বসে রইল। মহারাজ তখন খুব স্নেহভরে তাকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন—"দেখ, তুই যাদের উপকার করবি তারাই তোর অনিষ্ট করবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকের এত উপকার করলেন, কিন্তু যারা তাঁর সাহায্য পেয়েছে তারাই তাঁর নিন্দা ও অনিষ্ট করেছে। শেষকালে তিনি লোকের উপর disgusted (বিরক্ত) হয়ে গিয়েছিলেন। কোন লোক তাঁকে নিন্দে করছে শুনলে তিনি এমনও বলেছেন—'কই, আমি তো তার কোন উপকার করিনি।' এই হলো সংসারের ধর্ম। তবে কি জানিস—সৎধর্ম অন্য রকম। সৎভাবের লোক উপকার করেই যাবে, ঐ তাদের স্বভাব। দুষ্ট লোক অনিষ্ট করবে সেও তাদের স্বভাব।"

"একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ করত। একদিন একটি বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হলো এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পাড়ে তুলে দিলে। বিছেটাকে যেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পাড়ে তুলে দিলে—বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, 'দেখুন, বিছেটা আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন ?' তাঁর কথা শুনে সাধু জবাব দিলে, 'বিছের স্বভাব কামড়ান, সে কামড়াচ্ছে ; সাধুর

স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন?' এই বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, যাতে না আর জলে পড়তে পারে। যাদের সৎস্বভাব, তারা এইরূপই করে যাবে—তারা কখনো নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

স্থান—মাদ্রাজ মঠ

জুন, ১৯২১

প্রশ্ন—মহারাজ, আমরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসেছি, তবু তো মনের গোলমাল যায় না; পাঁচ জনে একসঙ্গে মিলে থাকতে পারি নে!

উত্তর—দেখ বাবা, সব সহ্য করে যাবি। ঠাকুর বলতেন, "যে সয় সে রয়।" দেখ পাঁচজনের সঙ্গে মিলে থাকার মতো কি আর গুণ আছে? সংসারে কত সহ্য করতে হয়! যারা অন্যের মনে কষ্ট দেয়, তাদের কি কখনো কল্যাণ হবে?

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"—সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলে বলবে না। অপ্রিয় সত্য বললে যদি কারু মনে কষ্ট হয় তাহলে তা কখনো বলবিনি। এই দেখ না আমার কাছে ভাল-মন্দ কতরকম লোক আসে—সকলকে সমান আদর-যত্ন করি। মন্দ লোক এলে তাকে দূর-ছাই করলে সে যায় কোথায়? সনক-সনাতনের মতো লোক নিয়ে সকলেই থাকতে পারে। সব রকমের লোক নিয়ে থাকাই আসল।

প্রশ্ন—মহারাজ, মহাপুরুষদের সম্বন্ধে স্বপ্ন কি সত্য?

উত্তর—হ্যাঁ, খুব সত্য। মহাপুরুষেরা স্বপ্নে দর্শন দেন। তাঁরা কৃপা করে অনেক কিছু স্বপ্নে করে দেন। দেবদেবী, ইষ্ট ও

মহাপুরুষদের বিষয়ে স্বপ্ন খুব সত্য। এই সব স্বপ্ন যাকে-তাকে না বলাই ভাল। উহাদের impression (ছাপ) ও effect (ফল) অনেক দিন থাকে।

প্রশ্ন—মহারাজ, শুনেছি, ঠাকুর নাকি আবার বর্ধমান অঞ্চলে শিগ্রই আসবেন—ইহা কি সত্য ?

উত্তর—কই তা তো শুনিনি। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আবার আসবেন এইরূপ শুনেছি।

প্রশ্ন—মহারাজ, কেউ বলে একশ বৎসর পরে, আবার কেউ বলে দুশ বৎসর পরে আসবেন !

উত্তর—আমি সময় সম্বন্ধে কিছুই জানি না—কিছু শুনিওনি।

স্থান—জনৈক ভক্তগৃহ

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

মহারাজ জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন ?

উত্তর—মন্দ নয়, এক রকম চলে যাচ্ছে।

মহারাজ—মন কেমন বলুন ?

উত্তর—আজকাল মন্দ নয়।

মহারাজ—বেশ, তাহলেই হলো, মন ভাল থাকলেই হলো। তাঁর পাদপদ্ম স্মরণ করে থাকুন, তিনি যেমন ইচ্ছা করবেন। তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মনটা ফেলে রাখবেন, সংসার ছেড়ে দিন। সংসারে বেশি মন দেবেন না, এ অতি জঘন্য স্থান, তবে যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করবেন। আপনি একটু খাটুন—আপনার ভিতরে জিনিস আছে, একটু খাটলেই হয়ে যাবে। Struggle, struggle, (চেষ্টা, চেষ্টা) you must have to struggle hard (আপনাকে

প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে)। লেগে যান—একটু খাটলে দেখতে পাবেন, কি আনন্দ, কি মজা! এই মায়া অতিক্রম করতে হবে—এই জীবনেই এর পারে যেতে হবে। এই মায়া অতিক্রম করা কি সহজ! খুব পরিশ্রম করুন। খুব বিশ্বাস থাকা চাই। সন্দেহের লেশমাত্র থাকলে হবে না। জোর করে বিশ্বাস করতে হবে।

প্রশ্ন—মাঝে মাঝে যদি অবিশ্বাস আসে?

মহারাজ—কি জানেন, ঠিক পাকা বিশ্বাস—সেটা realisation (অনুভূতি) না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে তখন ভাবতে হয়—ভগবান সত্য; আমার অদৃষ্টদোষে আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুঝতে পারছিনি। যখন তাঁর কৃপা হবে তখন হবে।

এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে? তিনি এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজত্ব, মনই হলো এর কর্তা। এইসব মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা যখন সেই মন develop (বিকাশলাভ) করে তখন নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও final (চরম) নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, তবে অনেক দূর উপরে নিয়ে যায়। তখনই বাইরের জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

তার পরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না—অস্তি-নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।

বেদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের কথা আছে। এই তিন গুণের পারে যেতে হবে। ত্রিগুণাতীত হতে হবে। গীতায় আছে—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে—মারামারি, কাটাকাটি, দ্বেষ, হিংসা, অভিমান ও অহঙ্কার। রজোগুণে খানিকটা ধর্ম আছে, কিন্তু নাম যশ এইসব তার লক্ষণ। কি রকম জানেন? একজন বসে খানিকক্ষণ ধ্যান করলে, তারপর ধ্যান থেকে উঠে চারদিক তাকিয়ে দেখলে, কেউ দেখতে পেলে কি-না। তারপর সত্ত্বগুণ। বেদে এই তিন গুণের কথা আছে, তার ওপারের কথা নেই। বেদের ওপারে যেতে হবে।

প্রশ্ন—এই সংসারে কতকগুলো কাজ করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে হয়। সেগুলো কি ভাবে করা যায়?

মহারাজ—আপনি যদি এভাবে করতে পারেন যে, এটা ভগবানের সংসার—আমার নয়, তাহলে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। সংসারে কোনটাই 'আমার'—এ বোধ রাখবেন না। আমায় যতদিন তাঁর ইচ্ছা রাখবেন, আবার যখন খুশি সরিয়ে দেবেন।

সংসারে কাজকর্ম করবার সময় খুব মন দিয়ে করবেন, আপনার উদ্দেশ্য কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। মনে মনে কিন্তু ঠিক থাকবে, আমার কিছুই নয়—কোন জিনিসেই আসক্তি থাকবে না। মনে প্রাণে জানতে হবে আমি কিছুই না, তিনিই সব করছেন। তাঁর ইচ্ছায় এ সংসার থাকলেও ভাল, না থাকলেও ভাল। তাঁর যেরূপ ইচ্ছা করুন।

প্রশ্ন—এ রকম করে সংসার করতে করতে মন যদি কখনো

গুলিয়ে যায়—হয়তো কোন বস্তুতে 'আমার'-বোধ হলো, কোনটায় বা আসক্তি হলো, তখন কি করব ?

মহারাজ—Do not yield to depression (হতাশার প্রশ্রয় দিবেন না)। Never allow yourself to be depressed (নিজেকে হতাশ হতে দেবেন না)। এক একবার গুলিয়ে যেতে পারে, তা গেলই বা। আবার জোর করে লেগে যেতে হবে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে যাতে আর না গুলিয়ে যায়। যতবারই গোল হোক না কেন, কিছুতেই depressed হবেন না। সর্বদা মনেতে উৎসাহ থাকবে। খুব উদ্যমের সহিত লেগে যান, কিছুতেই ছাড়বেন না। To do or die let this be your motto (মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন—ইহা আপনার জীবনের আদর্শ হোক)। ভগবানলাভ করতেই হবে, এই জীবনেই করতে হবে। যদি এই দেহে ভগবানলাভ না হলো, যদি এই মন দ্বারা তাঁকে লাভ করা না যায়, তবে কাজ কি এই শরীর দিয়ে ? কি হবে এই মন দিয়ে ? এ শরীর-মন ধ্বংস হলেই বা আমার ক্ষতি কি ? যে রকমেই হোক আমার ভগবানলাভ করতে হবে, তাতে শরীর থাক আর যাক।

প্রশ্ন—এই যে বিভিন্ন পূজাবিধি ও নানা রকমের দেবদেবী, এর ভেতর কি কিছু বিশেষত্ব আছে ?

মহারাজ—বিভিন্ন দেবদেবী যা-কিছু ও-সবই এক। ও-সবই এই মনের সৃষ্টি। শাস্ত্রে চার রকম সাধনা আছে—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাঽধমাধমা ॥"

সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম—সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্বদা তাঁর অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন

আর আমি আছি—জপতপ সব বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ আর চলে না। তার নিচে স্তবস্তুতি ও জপ—জপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নিচে হচ্ছে এই বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনা। এই সবই হচ্ছে different stages of evolution (ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা)। যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায়। ধরুন, একজন ordinary man (সাধারণ লোক)—তাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা সমাধিসম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার ভালও লাগবে না—দু-এক দিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুল, বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। তার মনটাও খানিকক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায়। তারপর ক্রমে সে সেই stage outgrow (অবস্থা অতিক্রম) করে।

মন যত fine (সূক্ষ্ম) হতে থাকে, gross (স্থূল) জিনিসে আর সেই রকম রস পায় না। ধরুন, আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে জপ করা ভাল, তখন জপটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে। এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে natural growth (স্বাভাবিক উন্নতি)। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট হয় না।

মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে

পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে যদি কেউ আপনাকে ছুঁড়ে দেয় তাহলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন—কোন একটা ভাব আমার পক্ষে বিঘ্নকর জানা থাকা সত্ত্বেও সে ভাবটা যদি বার বার মনে উঠে তখন কি করব?

মহারাজ—ভাববেন এই ভাবটা আমার অত্যন্ত বিঘ্নকর, আমার পরম শত্রু, আমার সর্বনাশ করতে পারে। এই চিন্তা আপনি বার বার মনের উপর impress (অঙ্কিত) করুন—দেখবেন আপনা থেকে সে ভাবটা মন থেকে চলে গেছে। মনে করুন, এই যে ছেলেটা বসে রয়েছে, ও ছেলেটাকে আপনি ভাবুন ওটা কিছু নয়, অতি অপদার্থ—তখন দেখবেন ও ছেলেটার সম্বন্ধে আপনার মনে কোন impression-ই (সংস্কারই) হবে না, ওর দিকে আপনার মন আর মোটেই যাবে না। আর একটা কথা ধরুন—একটি ছোট ছেলের কথা। সে জানে না বিষ খেলে কি হয়, তার কাছে খানিকটা বিষ থাকলে সে ভয় পায় না। কিন্তু আপনি যদি খানিকটা বিষ দেখতে পান, তাহলে শিউরে উঠে বাপরে বলে দশ হাত দূরে সরে যান—আপনি জানেন কিনা বিষ খেলে মানুষ মরে যায়। মনটা এমন মজার জিনিস—যা শেখাবেন তাই শিখবে।

Ideal fixed (আদর্শ স্থির) হওয়া আগে চাই। ভগবানই জীবনের একমাত্র আদর্শ। Ideal must never be lowered —(আদর্শকে কখনো ছোট করবেন না)। 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্'—তিনি ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র, আবার এই solar system-এর (সৌর জগতের) চেয়েও বড়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, এটা জানতে হবে। তিনি আপনার ভিতরেও আছেন, আমার

ভিতরেও আছেন, আবার জীব জন্তু উদ্ভিদ সকলের ভিতরেও আছেন। তবে কোথাও তাঁর বেশি প্রকাশ, কোথাও তাঁর কম প্রকাশ; কিন্তু সেই এক পরমাত্মাই সর্বত্র রয়েছেন। একটু খাটুন, দেখতে পাবেন এতে কি মজা। সংসার তো দেখলেন, এখন এ দিকটা একবার দেখুন। "Knock and it shall be opened unto you"—ধাক্কা মারুন, দরজা খুলে যাবে। পর্দা ফেলা রয়েছে, সরিয়ে দেখতে হবে। এই মায়ার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু নয়, অতি সহজ। একবার লেগে যান, দেখবেন দুনিয়া আর এক রকম হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—শাস্ত্রাদিতে যা আছে, ওসব কি বিশ্বাস করা যায়?

মহারাজ—হাঁ, ওসব সত্য। লোকের কল্যাণের জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে ঐ সমস্ত ব্যবস্থা করা রয়েছে, ওসব মানতে হয়। শাস্ত্রোক্ত কর্মটা রাখবেন, তা না হলে চলবে না। ঐ কর্মই আপনাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কর্মটা হচ্ছে অনাদি কিন্তু সান্ত। যখন আপনার সত্যোপলব্ধি হবে, তখন ওসব কর্ম আপনা থেকেই খসে যাবে।

প্রশ্ন—আহারাদি কি রকম করা যায়?

মহারাজ—বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন! এর জবাব দেওয়া বড়ই মুশকিল। মানুষের system (শরীরের ধাত) এত আলাদা যে সকলের জন্য একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না। কোন একটা জিনিস ধরুন আমার ধাতে সয়, কিন্তু আপনার ধাতে সয় না। আমার system (শরীর) কোন একটা জিনিস assimilate (গ্রহণ) করতে পারে, আপনার তা হয়তো পারে না। সেইজন্য আমাদের গীতাদি শাস্ত্রে খাবার সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কিছু বলে নাই। গীতায় আহারের কথা যা উল্লেখ আছে, সে কেবল একটা general classification (সাধারণ বিভাগ)।

মোটামুটি এই বলা যায় যে, গুরু ভোজন না হয়, আর ওরই ভিতরে দেখে শুনে যার পেটে যা সয়, এরূপ খাওয়া উচিত।

প্রশ্ন—মহারাজ, মাছমাংস খাওয়াতে কি হিংসাবৃত্তি হয় না?

মহারাজ—ও কোন কথা নয়। তবে যে বলে "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" সে কখন?—যখন সমাধি হয়েছে, জ্ঞানলাভ হয়েছে, সর্বভূতে ভগবানদর্শন হয়েছে। তা না হলে অমনি মুখে বললেই বুঝি অহিংসা হলো? যখন দেখবেন আপনিও যা ঐ পিঁপড়েটিও তা, কোন ভেদ নেই, তখন ঠিক ঠিক অহিংসা, তার পূর্বে কি কখনো হয়? এই যে বলছেন অহিংসা, আপনি কি হিংসা avoid (ত্যাগ) করতে পারেন? কি খাবেন—আলু? আলু পুঁতলে তাতে গাছ হয়, তাতে আবার আলু হয়। সেটার প্রাণ নেই? ভাত খাবেন? ধানগুলো ছড়িয়ে দিন, তাতে গাছ হবে, তাতে আবার ধান হবে, তার কি আর প্রাণ নেই? আচ্ছা, ধরুন জল—ওতে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, আপনি একটা microscope (অণুবীক্ষণযন্ত্র) দিয়ে দেখুন। কি করে সে জল খাবেন? বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাস নিতে হবে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনি অসংখ্য জীব নষ্ট করছেন, তার বেলা দোষ নেই—যত দোষ হলো মাছের। ও কথা কখনো কি টেঁকে? আচ্ছা, যারা vegetable-diet (নিরামিষ আহার) ভাল বলে, তারা দুধ-ঘি এসব তো খায়। দুধটা কি রকম করে খাওয়া যায়? একটা প্রাণীকে deprive (বঞ্চিত) করে তার মায়ের দুধটা দুয়ে নিচ্ছে, ওটা তো বিচার করলে একটা মহা cruel (নিষ্ঠুর) ব্যাপার। ও কোন কথা নয়। আমাদের ও সমস্ত কখনো ছিল না, পরে ওসব ঢুকে গেছে।

নাম-মাহাত্ম্য

নাম নাম নাম, কেবল নাম। তীব্র কর্ম কর, আর নাম কর। সব কর্মের ভিতর কর দেখি তাঁর নাম। এই নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে, তবে তো? করে দেখ, একদম সব জ্বালা ঘুচে যাবে। কত কত মহাপাতকী এই নাম আশ্রয় করে শুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা হয়ে গেল।

খুব বিশ্বাস কর—নাম আর ভগবান। নাম-নামী এক করে ফেল। ভগবানই নাম হয়ে ভক্তহৃদয়ে বাস করেন।

ভগবানকে খুব ডাকতে থাক। নির্জনে একা বসে তাঁকে ডাকতে হয়। আর মাঝে মাঝে প্রার্থনা কর—আমাকে কৃপা কর, আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। এমন অনুরাগের সঙ্গে ডাকবে যে, চোখের জল বুক বেয়ে পড়বে। মন মুখ এক করতে হবে।

সংসারের মধ্যে সকলকে হরিময় দেখবে—ভাববে, হরি আমার সর্বভূতে আছেন। ঐ রকম করতে করতেই 'তৃণাদপি সুনীচঃ' হয়ে যাবে। সকলের কাছে বসবে ও শুনবে কেবল হরিকথা। যে স্থানে হরিগুণানুকীর্তন হয় না, সে জায়গা শ্মশানের মতো বলে জানবে। এই হরিনামের বলে শ্মশানের ভূত পর্যন্ত পালিয়ে যায়।

তাঁর নাম কর, তাঁকে ডাক। তিনি তো আপনার লোক। কেন তিনি দেখা দেবেন না? তাঁর কাছে সব জানাও, তিনিই সৎপথ দেখিয়ে দেবেন। আবদার করতে হয় তো তাঁর কাছেই কর। তিনি সব পূরণ করে দেবেন।

দীক্ষা আর কি? তোমার যে নামে মতিগতি, তুমি তাই করবে। বিশ্বাস করে মনের অভিলাষ-মতো নাম করলেই হলো। দীক্ষিত হওয়া তেমন কিছু নয়—এই ধ্যান-ধারণাই করতে হবে, তাঁকে প্রাণের

সহিত ডাকতে হবে। তাঁতে আরও বিশ্বাস ভালবাসা হবে, এইজন্য একজনকে মেনে নিয়ে কাজ করা। এখন খুব ধ্যান লাগাও।

প্রথম অবস্থায় প্রার্থনা করা ভাল। তাঁকে ডাকবে, তাঁর মহিমা কীর্তন করে তাঁর প্রার্থনা আরম্ভ করবে।

ভগবানকে ডাকবে আর বলবে—'হে ভগবান, তোমার এই চন্দ্র-সূর্য তোমার এই সৃষ্টি। তুমি দয়াময়, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, তুমি আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে সদ্বুদ্ধি দাও, শ্রদ্ধা দাও, ভক্তি দাও, ভালবাসা দাও'—এই বলে তাঁকে ডাকবে।

হাজার কাজই থাক আর যাই কেন না হোক, নিত্য দুবেলা তাঁর স্মরণ-মনন করতে ভুলো না। দেহ-মন শুদ্ধ, শরীর নির্মল ও নিষ্পাপ করতে তাঁর নামজপ ও ধ্যানভজন ছাড়া দ্বিতীয় জিনিস আর কিছুই নেই। তিনি বড় সহজ, বড় আপনার। তাঁকে আপনার করে ফেল—তাঁরই হয়ে যাও। প্রিয় বস্তু যদি দুর্লভ হন, তবে তিনি পরমপ্রিয় হন।

নাম কর, নাম শোন। নামই ভগবান। নাম না করে যা কিছু করবে, তাতে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে।

সাধন ভজন

খুব নিষ্ঠা করে সাধনভজন কর। একদিনও বাদ দিবি নে—ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, নিয়মিত সময়ে আসন করে বসবি। এই নিষ্ঠার সহিত অন্ততঃ তিন বৎসর যদি করতে পারিস তখন দেখবি ভগবানের উপর একটা প্রীতি আসবে। তখন আপনা থেকেই ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছা যাবে, চেষ্টা করেও মনকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারবি নে। মনের অবস্থা এইরূপ যখন হবে তখন ধ্যানজপ করে বেশ আনন্দ পাবি।

ভজন কর, ভজন কর। ভজনের একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দের স্বাদ একবার পেলে এসব আলুনী বোধ হবে। তখন যেখানেই থাকিস, যে অবস্থায়ই থাকিস, ভজন ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগবে না। অবশ্য প্রথম প্রথম আনন্দ পাওয়া যায় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছুদিন করে গেলে, পরে দেখবি আপনা থেকেই আনন্দ আসবে।

যারা সাধনভজন করে, সব অবস্থায়ই করে। যেখানে সুযোগ সুবিধা বেশি হয়, সেখানে তারা আরও জোর সাধনভজন করে। এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না করে যারা বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে পারে না—vagabond-এর (ভবঘুরের) মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে।

খুব জপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এইভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

স্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপধ্যান করতে গেলে নানা সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। খেতে শুতে, উঠতে বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।

আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) তো তোরা নিবি নে—বাবা, ঘুরে ঘুরে কিছু হয় না। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে কিছুকাল ধরে তাঁকে ডাকতে না পারলে কিছু হবার জো নেই। স্বামীজী এমন সুন্দর মঠ করে গেছেন। খাবার পরবার ভাবনা নেই।

দুটি দুটি খা আর সাধনভজন নিয়ে পড়ে থাক—তা নয় কেবল বাইরে ঘুরে vagabondising (ভবঘুরেগিরি) করে বেড়ান। তোরা বুঝি মনে করিস, কিছুদিন বাইরে ঘুরে এসে কেষ্ট বিষ্টু একটা হয়ে আসবি। তা কি হয় রে! ফাঁকতালে ধর্ম হয় না। তাঁকে লাভ করতে হলে সাধন-সাগরে ডুব দিতে হবে, একেবারে তলিয়ে যেতে হবে। সাধন নেই, ভজন নেই—গেরুয়া পরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আর ভিক্ষা করে খেলে হবে?

কাম জয় করব, ক্রোধ জয় করব বলে চেষ্টা করে রিপু জয় করা যায় না। ভগবানে মন দিলে ওসব আপনা থেকেই কমে যায়। ঠাকুর বলতেন, "পূর্বদিকে এগুলে পশ্চিম দিক আপনা থেকেই পিছনে পড়ে থাকে, কোন চেষ্টা করতে হয় না।" তাঁকে ডাক, তাঁকে ডাকলে রিপু-টিপু কোথায় সব পালাবে।

তোরা ধ্যান-জপ করিস যেন ভাসা ভাসা। ওকি দুই-এক ঘণ্টা জপ-ধ্যানের কর্ম রে! দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে তবে হবে। এই তোদের সময়। ওরে, ডুবে যা, ডুবে যা। আর সময় নষ্ট করিস নে। মহানিশায় খুব জপ-ধ্যান করতে হয়। ঐ সময় ধ্যান-জপের পক্ষে বড়ই অনুকূল।

প্রথম অবস্থায় খুব আস্তে আস্তে জপ-ধ্যান বাড়িয়ে যেতে হয়। আজ এক ঘণ্টা, দুদিন বাদে আরও কিছুক্ষণ বাড়ালে, আবার কিছুদিন বাদে আরও কিছুক্ষণ বাড়ালে—এইভাবে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যেতে হয়। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে খুব হুড়মুড় করে জপ-ধ্যান করতে গেলে reaction (প্রতিক্রিয়া) সামলান দায়। Reaction সামলাতে না পারলে মন বড় নিচে চলে যায়। তখন ধ্যান-জপ করতে আর মোটেই ইচ্ছা হয় না। সে মনকে তুলে নিয়ে আবার ধ্যান-জপে বসান বড় শক্ত ব্যাপার।

তাঁর কৃপা চাই। তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপার

জন্য দিনরাত তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনায় খুব কাজ হয়। তিনি বড় শোনেন। সাধন-ভজন অভ্যাস করা দরকার। যেদিন যেমন সেদিন তেমন করবে। পাঁচ মিনিট হয় সেও ভাল কিন্তু এক সময়ে দরকার। রাত্রিতে ধ্যানের প্রশস্ত সময়—মাথা পরিষ্কার থাকে। অধিকক্ষণ ধ্যান-ধারণা করলেও ক্ষতি হয় না। আবার এ সময়ে প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া যায়। ধ্যান করা নীরবেই ভাল। এইজন্যই রাত্রে ধ্যান করা ভাল।

কর্ম

বড় বড় কাজ করা সোজা, অনেকেই করতে পারে। নাম-যশের জন্য অনেক সময় অনেক বড় বড় কাজ করতে পারা যায়। ছোট ছোট কাজের ভিতর দিয়েই মানুষকে বোঝা যায়, তার চরিত্র কতদূর গড়েছে। যারা ঠিক ঠিক কর্মযোগী, তারা অতি হীন কাজ হলেও সে কাজ ভগবদ্বুদ্ধিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে করে। লোকের বাহবা নেবার জন্য তারা কখনো কিছু করে না।

মনের মতো কাজ হলে সবাই করতে পারে। তাহলে কি আর কাজ করা চলে, বাবা? যে-কোন কাজই হোক না কেন, যে-কোন কাজই আসুক না কেন, ঠাকুরের কাজ জেনে সব রকম কাজে নিজেকে adjust করে (খাপ খাইয়ে) নিতে হবে।

শুধু কর্ম করলেই হবে না। ভগবদ্ভাব আশ্রয় করে কর্ম করতে হবে। বার-আনা মন ভগবানে দিয়ে রাখতে হবে, আর বাকি চার-আনা মনে কর্ম করতে হবে। এইরূপ ভাবে চললে ঠিক ঠিক কাজ করতে পারবি—মনেতে উদারতা আসবে, আনন্দ আসবে। আর

সাধনভজন ছেড়ে দিয়ে কর্ম করতে গেলে সহজেই অহঙ্কার, অভিমান আসবে, আর যত ঝগড়াঝাঁটি ও অশান্তির সৃষ্টি হবে। কর্মই করিস আর যাই করিস, সাধন-ভজন ছাড়িস নে।

শিশিটা ভেঙে ফেললি? যত অলক্ষুণে স্বভাব! কি উড়ো উড়ো মন নিয়ে তোরা কাজ করিস! কাজ করতে করতে অত কি ভাবিস? অত অস্থির মন নিয়ে কোন কাজই হয় না—না ধর্ম না কর্ম। মন স্থির করে সব কাজ করতে হয়—তা ছোট কাজই হোক আর বড় কাজই হোক। যাদের কাজেতে মন স্থির হয়, তাদের জানবি ধ্যান-জপেতেও মন স্থির হয়।

কর্ম করতে গেলে, প্রথমতঃ কর্মেতে খুব প্রীতি থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ ফলের দিকে মোটেই দৃষ্টি থাকবে না। তবেই ঠিক ঠিক কর্ম করা যায়। এই হলো কর্মযোগের secret (কৌশল)। যা কিছু করবি সবই ঠাকুরের কাজ জানবি। তাহলে কর্মেতে কখনো অপ্রীতি হবে না, ফলেতেও আসক্তি আসবে না। এই ভাব ছেড়ে দিয়েই তো তোদের গোড়ায় গলদ হয়; কাজই বা করবি কি, আর ধর্মই বা করবি কি!

কাজ করতে এত ভয় পাস কেন? (পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) এরা যা বলবেন করবি। তাতে তোদের মহাকল্যাণ হবে জানবি। এঁরা সব মহাপুরুষ লোক। এঁদের কথা না শুনলে ধর্মকর্ম কিছুই হবে না, বাপু। যা বলছেন করে যা।

সব কাজই কাজ। সাধনভজন করাও কাজ, আবার সংসার-পালন করাও কাজ। ঠিক ঠিক করতে পারলেই হলো। সবই ভগবানের প্রার্থনাস্বরূপ—Work is worship.

গীতায় কর্মের কথা আছে—এই কর্ম দ্বারাই লোক মুক্ত হবে, নির্বাণলাভ করবে। কর্ম বড় কঠিন। Cool brain (ঠাণ্ডা মাথা),

ত্যাগ-বৈরাগ্য খুব দরকার। তা না হলে ওতে ডুবতে হয়। সিদ্ধি-লাভের পর প্রকৃতপক্ষে কর্মের অধিকারী হয়।

সাধকের কর্তব্য

বাইরে তপস্যা করতে গিয়ে ছত্রের অন্ন খেতে নেই। যত শ্রাদ্ধের টাকা গৃহস্থেরা সাধুসেবার জন্য দিয়ে যায়। তা ছাড়া কত বাসনা-কামনা করে টাকা দেয়। এসব কারণে ছত্রের অন্ন শুদ্ধ নয়। মাধুকরী করে খাওয়া ভাল। মাধুকরীর অন্ন খুব শুদ্ধ অন্ন।

একা একা নির্জনে গিয়ে সাধনভজন করা বড় শক্ত। ভগবানে খুব প্রীতি, অনুরাগ থাকলে তবে হয়। প্রথম প্রথম একা থাকতে গেলে পতনের খুব সম্ভাবনা। এইজন্য মনের মিল আছে এমন দুইজন একসঙ্গে থাকতে হয়। দুইজন একসঙ্গে থাকলে পরস্পর পরস্পরে সাহায্য হয়। আবার দুইজনের বেশি একসঙ্গে থাকলে আড্ডা হয়।

আড্ডা দেওয়া সাধনভজনের পক্ষে বড় বিঘ্নকর। মনকে বড় বিক্ষিপ্ত করে দেয়, ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়।

সাধনভজন করতে গেলে খাওয়া কমিয়ে দিতে হয়। এক-পেট খেয়ে ধ্যান-জপ হয় না। হজম করতেই সব energy (শক্তি) বেরিয়ে যায়, মন বড় চঞ্চল হয়। এইজন্যই গীতায় যুক্তাহারবিহারের কথা বলেছে।

ভোগ-টোগের দিকে এখন বেশি নজর দিস নে। এখন একটু চেপেচুপে থাক। এখন তোদের সব বিষয়ে খুব সংযত হওয়া দরকার। ঠাকুরের কৃপায় বেঁচে থাকিস তো পরে আপনা থেকেই ওসব জিনিস কত আসবে। তখন দেখবি কোন জিনিস

পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না, কোন জিনিসে আসক্তিও হবে না।

সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সাধু হয়ে, কর্তাম করতে যাওয়া কি হীনবুদ্ধি! কর্তৃত্বাভিমান সাধুর পক্ষে মহা বন্ধনের কারণ। যা কিছু করবি, জানবি তাঁর কাজ; যা কিছু দেখছিস, জানবি সব ঠাকুরের। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।" মিথ্যা বলা মহাপাপ। যদি কেউ মদ খায়, বেশ্যাবাড়ি যায়, তাকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে মিথ্যা বলে তাকে এতটুকুও বিশ্বাস করা যায় না। মিথ্যার মতো মহাপাপ দুনিয়াতে আর নেই।

পরনিন্দা, পরচর্চা কখনো করবি নে। উহাতে নিজেরই ক্ষতি হয়।

রাতদিন অপরের কুভাবগুলো আলোচনা করে করে নিজের ভেতর যেটুকু সদ্ভাব ছিল নষ্ট হয়ে গিয়ে মনের উপর ঐসব কুভাবের ছাপ পড়ে যায়।

খা দা, আনন্দ কর, মজা কর। কার কি দোষ আছে না আছে দেখবার দরকার কি? সকলের সঙ্গে মিশবি, আনন্দ করবি। তা নয়, সাধু হয়ে এ ও করেছে, সে তা করেছে বলে পাঁচজনে মিলে জটলা করা আর লোকের পিছনে লাগা বড় খারাপ। অতি হীনবুদ্ধি না হলে ওসব হয় না।

কে কি করেছে, কার কি হলো—ওসব দেখবার বা ভাববার কিছুমাত্র দরকার নেই। তুমি নিজে ঠিক পথে এগিয়ে চল। লক্ষ্য ঠিক রেখে তোমরা গন্তব্য পথে চলে যাও।

সব সময় মানুষের গুণ দেখতে শেখ। একটু গুণ থাকলেও তাকে বড় করে দেখতে হবে, সম্মান দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে। গুণের আদর না করলে মানুষ বড় হতে পারে না, নিজের মনও উদার হয় না।

বসে বসে গৃহস্থের অন্ন খেয়ে সাধনভজন না করা সাধুর পক্ষে জুয়াচুরি। সাধু সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভজন করবে বলেই গৃহস্থ তাকে দুটি খেতে দেয়। সাধনভজন না করে গৃহস্থের অন্ন খাওয়াতে মহা অকল্যাণ হয়। সাধু গৃহস্থের নিকট যে-কোন ভিক্ষা গ্রহণ করলেই তার শুভকর্মের ফল তাতে বর্তায়। এইজন্য সাধুর এমন সাধনভজন করা চাই যে, খরচ হয়েও জমে।

মানুষের দোষ দেখে তাকে হেয় জ্ঞান করতে নেই। তাকে ভালবাসা দিয়ে আপনার করে ভালর দিকে নিয়ে যেতে হয়। ভালমন্দ সকলের ভিতরেই আছে। দোষ দেখতে সকলেই পারে, মানুষকে ভাল করতে পারিস তো বুঝব ক্ষমতা আছে।

দেখ বাবা, তোরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। তোদের সব সময় স্থির, ধীর, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হতে হবে। তোদের কথাবার্তা চালচলন, সবটার ভিতরেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হবে। তোদের সংস্পর্শে এলে মানুষ প্রাণে শান্তি পাবে এবং তাদের হৃদয়ে ধর্মভাব জেগে উঠবে।

ব্রহ্মচর্য কি জান? সত্যকথা বলা, জিতেন্দ্রিয় হওয়া, মন ও বাক্যের সংযম, মদ-মাংস না খাওয়া, হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা না করা। যে দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য করতে পারে তার আর ভাবনা কি? ব্রহ্মচর্য চাই। তাই ছেলেবেলা থেকেই ব্রহ্মচর্য আরম্ভ হয়।

একটু বাইরে—তীর্থস্থানে গিয়ে দিন কতক আড্ডা কর, অনেকদিকে সুবিধা হয়ে যাবে। প্রকৃতির একটা নূতন দৃশ্য দেখে মনের গতি খুব ভাল থাকবে, শরীরও সুস্থ থাকবে, আর ধ্যানেরও সুবিধা হবে।

চিত্ত শুদ্ধ হওয়া চাই। সংসারে কত ভয়! সাধনপথে গেলেই কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কখন কোন্‌টা উঁকি মারে—তার দমন। প্রত্যেক পদেই বাসনাদির দমন করতে চেষ্টা করতে হয়—পাছে

জড়িয়ে ধরে। প্রথমে কিছুদিন নির্জন চাই—মনের আঁট চাই। তারপর সব ধীরে ধীরে হতে থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এক এক স্থানে এক একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—ঐ সময় সাধনভজন বেশ অনুকূল। ঐ সময় বেশ একটা spiritual current (অধ্যাত্মিক স্রোত) বয়। তখন জপধ্যান করতে বসলে মন সহজে স্থির হয়ে যায়, বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—মহারাজ, কি করে সে সময় ধরতে পারা যায়?

মহারাজ—ও বোঝা কিছু শক্ত নয়। যারা ঠিক ঠিক সাধন-ভজন করে, কিছুদিন বাদে সহজেই তারা ও-সব ধরতে পারে, বুঝতে পারে।

কাশী হচ্ছে জগৎ ছাড়া—মহাচৈতন্যময় স্থান। এখানে বসে ভজন করলে যা করা যায়, তার দশগুণ বেড়ে যায়। আর খুব শীঘ্র শীঘ্র মন্ত্র-চৈতন্য হয়। কাশী মুক্তক্ষেত্র—এখানে বাবা বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে জীবকে মুক্তি দিচ্ছেন। এখানে ছোট-বড়, ধনী, গরিব, যেই হোক না কেন, সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। জো সো করে এখানে পড়ে থাকতে পারলেই হয়।

ঠাকুর একদিন বললেন, "কালীঘরে ধ্যান করছি তখন যেন একটা একটা চিক (পরদা) উঠে যেতে লাগল—মায়ার বা অজ্ঞানের। আর একদিন মা আমায় দেখালেন যে, কোটি সূর্যের জ্যোতি সামনে। সেই জ্যোতি থেকে আর একটা চিদ্‌ঘনরূপ দেখলাম। আবার খানিক পরে সেটা জ্যোতিতে মিলিয়ে গেল। নিরাকার যেন সাকার হলো, আবার সাকার যেন নিরাকার হলো।"

একদিন কালীপদ ঘোষ কালীমন্দিরে ঢুকে মাকে খুব গালি-গালাজ আরম্ভ করল। তার বুকটা লাল হয়ে উঠল, আর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ঠাকুর গালাগাল শুনে কালীঘর থেকে চলে এসে বললেন, "আমাদের মাতৃভাব। ওভাব বড় শক্ত। খুব আপনার লোকের উপরই অত অভিমান চলে।"

সমাধি দুরকম—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সবিকল্পে রূপদর্শন হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণী লোক যে যেভাব আশ্রয় করে, সে সেইরূপ দর্শন করে। এই সব অনুশীলন না করে লোক কি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রত থাকে! ভগবানই হচ্ছেন আপনার লোক—এইটি বেশ করে জেনে realise (প্রত্যক্ষ) করতে হবে। নির্বিকল্পে রূপ-টুপ নেই—জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সব ভুল হয়ে যায়। কাশীপুর বাগানে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। তিনি ওসব খুব চেপে রাখতে পারতেন। আর এক প্রকার সমাধি আছে—আনন্দ-সমাধি। তাতে এত প্রেমানন্দভোগ হয় যে, এই শরীরে আর সেটা রাখতে না পারায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায়। সেই অবস্থায় একুশ দিন মাত্র শরীর থাকে।

দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। "যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"! "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা" প্রভৃতির মানে হচ্ছে হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্য রথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন—

"তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি।" উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি! বাস্তবিক সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে? ঠাকুর বলতেন—"দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে—সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।"

রাজার সাতদেউড়ি বাড়ি। কোন গরিব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়িতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা? উত্তর হয়—'না'। এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়িতে প্রবেশ করে রাজ-দর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন।

নিজের মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুরু। যখন ধ্যান করে মন স্থির হয়, তখন সেই মন তোমাকে পর পর যা করতে হবে সব বলে দেবে। এমনকি দৈনিক কার্যেও এর পর এটা, তারপর সেটা—বলে দিয়ে ঠিক তোমার হাত ধরে নিয়ে যাবে। ভগবানে অনুরাগ ভালবাসা চাই। তবেই মন স্থির হবে।

Mental (মানসিক), physical (দৈহিক) and spiritual (আধ্যাত্মিক)—এই তিন শক্তির একত্র সমাবেশ না হলে ধর্ম হওয়া বড় শক্ত। ভগবানলাভ করা কি সোজা ব্যাপার রে?

খুব কর্ম করবে, আর কর্মের সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করবে। বিশ্বাস ভিন্ন কেউ ভগবানকে লাভ করতে পারে না। যে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে নিশ্চয়ই ভগবানকে পেয়েছে।

যদি বিশ্বাস কর তবে কানাকড়িরও দাম আছে, আর যদি বিশ্বাস না কর তবে সোনার মোহরেরও দাম নেই। যাদের ভগবানে বিশ্বাস হয়নি, তারা এটা ওটা বাছে; আর যাদের ভগবানে পাকা বিশ্বাস হয়েছে, তাদের সব সংশয় চলে গেছে।

ত্যাগ না করলে ভগবানে ভক্তি আসে না। ত্যাগ নিশ্চিত চাই। ত্যাগ হচ্ছে—অহঙ্কারটা নষ্ট করা।

কতকগুলো লোক বলে—এই নাম না ভজলে হবে না, তুমি যে নাম বলছ তা ভুল। কার ভুল আর কার বা ঠিক! এই ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধি নিয়ে তোমার ভুল, আমার ঠিক—এই গণ্ডগোলে কাজ কি? মিথ্যে হতে হয় সব মিথ্যে, আর সত্যি হতে হয় সব সত্যি। একবার তলিয়ে বুঝলে তো সব বোঝা যায়। যার যে নাম ভাল লাগে সে তাই করুক না—তাতে কারুর আপত্তি হতে পারে না।

ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই না ছিল! খেতে বসেও যদি বলে ফেলতেন 'খাব না', তবে আর খাওয়া হতো না। একদিন যদু মল্লিকের বাগানে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড়ে সে কথা ভুলে গেছেন, আমিও আর কিছু বলিনি। রাত্রে খাওয়ার পর মনে পড়েছে। তখন অনেক রাত্রি, কিন্তু যেতেই হবে। আমি লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলুম—গিয়ে দেখি সব বন্ধ, সকলে ঘুমুচ্ছে। তখন বৈঠকখানার দরজা ফাঁক করে ভিতরে পা গলিয়ে দিয়ে এলেন।

কোন কোন মহাপুরুষরা বলেন, মনের দুই রকম গতি—অধোগতি ও উর্ধ্বগতি। অধোগতিতে হিংসা, স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাস, আলস্য ইত্যাদির, আর উর্ধ্বগতিতে ঈশ্বরে ভক্তি, শ্রদ্ধা,

ভালবাসা, প্রেম ইত্যাদির উদয় হয়। আবার কোন কোন মহাপুরুষরা বলেন, মনের তিন রকম গতি—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। তমোগুণে আলস্য, জড়তা, অহং ইত্যাদি বাড়ে। রজোগুণে ভাল খাব, ভাল থাকব, বাইরের পাঁচটা কাজ করব ইত্যাদি ভাব। আর সত্ত্বগুণে ঈশ্বরের নামগুণগান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম—এই সব সদাই মনে জাগ্রত হয়। মনের যে এই গতি আছে তা অতি সত্য। এ আমরা পদে পদে দেখতে পাই।

প্রথমে সাধনভজন করতে গেলে আহার ও স্বাস্থ্য অনুকূল হওয়া চাই। কোথায় মন চলে যায়, মাথা-টাথা এক রকম হয়ে যায়। এই সব করতে হলে একটু গাওয়া ঘি, দুধ খেতে হয়। শরীরও সুস্থ হওয়া চাই।

ঠাকুরের রাসমণির দেবালয়ে স্থান পেতেই তো সাধনভজনের কত সহায় হলো। যত মহাপুরুষ দেখা যায়, তাঁদের আহার ও স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল বলেই সাধনভজনের সুবিধা হয়েছিল। তবে আহারাদির সংস্থান না করতে পারলে কি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা থাকলে কোথা হতে এসে জুটে যায়। তখন আর ভাবতে হয় না—যখন যা দরকার তিনিই সব জুটিয়ে দেন।

ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ। ভক্ত ভগবানের একটা আকার চায়। কখনো রূপ দেখছে, তাঁকে ডাকছে, ভজন করছে, কাঁদছে ইত্যাদি। জ্ঞানীরা জ্যোতিঃ চায়, কত রকম জ্যোতিঃ দেখে। শেষে দুই-ই এক। এই ভক্তিপথ—এতেও সেই অজ্ঞানের ধ্বংস হয়; আর জ্ঞানপথেও অজ্ঞান, অবিদ্যার ধ্বংস হয়। কিন্তু জ্ঞান থাকে, জ্ঞান যায় না। যেটা যায় সেটা অজ্ঞান। এই জ্ঞানের পরপারে কি?—তা কেউ বলতে পারে না। যে যায় সে-ই জানে।

উপনিষদ্ বলে, ভক্তও ঠিক, জ্ঞানীও ঠিক। উভয়েরই পথ বলা আছে, তবে জ্ঞানের কথাই বেশি দেখা যায়।

ভাগবতগ্রন্থে প্রথম অবতারাদির কথা বলেছে। ভক্তের বেশ মনে লাগে। তাঁতে ভালবাসা আসে। আবার কত মূর্তির কথাও বলা আছে। কিন্তু একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানের চূড়ান্ত—একেবারে বেদান্ত।

যোগবাসিষ্ঠ, অষ্টাবক্রসংহিতা পুস্তকগুলি জ্ঞানের আদর্শ। এই সব গ্রন্থে জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে।

আমার সাংখ্যটি বড় ভাল লাগে। কেমন পুরুষ ও প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে সেই চরমপথে চলে গেছে। প্রকৃতি এবং পুরুষ চাই, উভয় না হলে সব হয় না। তাই উভয় নিয়ে কেমন বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে সেইদিকে নিয়ে গেছে।

এই সব দেখলে মনে হয়, কেনই বা এত সব। প্রলয় তো আছেই। এই যা দেখা যাচ্ছে, সবই লয় পাবে—তবে এই সব ব্যাপার কেন? তাঁর লীলা তিনিই জানেন। কে বুঝবে বল? প্রলয়ে এই সব কিছুই থাকবে না। এই দেখ না, মুহূর্তক্ষণ ভূমিকম্প হলে কি হয়। এর চেয়ে একটু বেশি হলে তো প্রলয়। তা হতে আর কত দেরিই বা লাগে। এই তো জীবের অবস্থা।

তৃপ্তি হচ্ছে না, মন ধু ধু করছে—শুধু তাঁকে পাবার জন্য আনচান হওয়াকেই অনুরাগ বলে। অনুরাগই তো দরকার।

দানের চেয়ে কি ধর্ম আছে? যীশুখ্রীস্ট বলছেন—Cast thy bread into the water—জলে ফেলে দাও আবার জলই তুলে

দিবে। একবার দাও, আবার আসবে। দান কি কম জিনিস গা? সকল ধর্মেই দানের কথা আছে।

দান তো করবে, কিন্তু তাতে আবার একটু টান দেওয়াও আছে। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দান করতে হয়, কারণ কত কষ্টের পয়সা—মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়। সে পয়সা সৎপাত্রে যাওয়াই ভাল।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করলে আমাদের তো কিছুই থাকে না। এই পৃথিবী সূর্য অপেক্ষা ছোট, আর আমরা এই পৃথিবী অপেক্ষা আবার কত ছোট। এও তো ব্যাপার। অনন্তের সহিত তুলনা করতে গেলে আমাদের কিছুই থাকে না। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা কতকগুলি নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলছেন, এগুলি সূর্য অপেক্ষা ঢের বড়—তা ছাড়া আরও এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পড়েনি। তাহলে ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি!

বুদ্ধদেব মড়া দেখে, জরাজীর্ণ দেখে জীবকে ত্রাণ করবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা মানুষকে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা হতে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য তিনি কত সাধনভজন করে শেষে নির্বাণলাভ করেন। হিন্দুধর্মের মুক্তিও তাই। তবে কিছু প্রভেদ আছে।

তাঁকে প্রাণের সহিত জানাবে, "হে ঈশ্বর! তুমি এত আপনার হয়ে কোথায় আছ? তুমি যে পিতা অপেক্ষা পিতা, মাতা অপেক্ষা মাতা, ভ্রাতা অপেক্ষা ভ্রাতা, বন্ধু অপেক্ষা বন্ধু, আত্মীয় অপেক্ষা

আত্মীয়। তুমি কোথায় আছ? তোমার দেখা কি পাব না?" এই সব বলে তাঁকে ডাকবে। আর জানাবে, "তুমি ব্যতীত আর যে ঠিক ঠিক লোক কেউ নেই। তোমার কাছে আবদার করব না তো কার কাছে করব?"

কোন এক সাধু দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছে শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, "যে আগুপিছু ভেবে কাজ করবে, সে শালা যাবে।"

ভগবানকে বিশালভাবে ভাবতে হয়। তাই বিশাল জিনিস—হিমালয় পাহাড়, সমুদ্র, না হয় আকাশ, এই সব দেখে বিশাল ভাবটি আনতে হয়।

বাইরে কিছুই নেই, সবই ভিতরে। বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে করতে বীণার ধ্বনি শুনতে পেতেন।

একদিন দুপুরবেলা আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করছি, পরমহংসদেব তখন শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করছিলেন। সেই সব বিচার শুনতে শুনতে গাছের পাখিগুলি পর্যন্ত বেদে যে-সব গান রয়েছে সে-সব গান করছে, শুনলুম।

আমি আর কি বলব বল। কল্যাণ হউক তোমাদের, ধ্যান-ধারণায় ও সাধনভজনে যেন সদা মন থাকে। তাঁকে জানাও, তাঁকে বল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

৺বৃন্দাবনধাম, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০

নমস্কার, নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

অনেকদিন আপনাদিগকে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। আপনার পীড়ার কথা বৃন্দাবনে আসিয়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি এতদিন আরোগ্যলাভ করিয়া কোন স্থানে change (বায়ুপরিবর্তন) করিতে গিয়াছেন। সকলই প্রারব্ধ। অদৃষ্টে যতদিন আছে, শরীরধারণের ভোগ, দুঃখ এবং সুখ ভুগিতে হয়। তজ্জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিবেন। আপনার যখনই জ্বর হয় অনেকদিন কষ্ট দেয়। যাহা হউক, আপনার একটি উত্তম স্থানে বায়ুপরিবর্তন করা দরকার; কারণ ঔষধাদি অপেক্ষা বায়ুপরিবর্তনেই আপনার বিশেষ উপকার হয়। যেখানে আপনার সকল রকমের সুবিধা হয় এমত স্থানে যাওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা কটক, যেখানে হউক, এই সময় কোন স্থানে যাইয়া থাকুন। অধিক বিলম্ব করিবেন না, কারণ সংসারে সকল সুবিধা করিয়া যাওয়া সব সময় সকলের ঘটে না। আপনি বিবেচক, যাহা ভাল বোঝেন তাহা করিবেন। এখানে শীত এখনো বিলক্ষণ আছে, তবে এখানকার লোকেরা বলে যে পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে এবং দশ-পনর দিনের মধ্যে আরও কম হইয়া যাইবে।

আমাদের কাশীধাম হইতে একটি সঙ্গী জোটে, তাহার সহিত নর্মদা যাই। নর্মদায় স্নানাদি করিয়া তাহার পর ওঙ্কারনাথ দর্শন করিয়া সেখানে কিছুদিন থাকা যায়। ওঙ্কারনাথ স্থানটি অতি উত্তম —নর্মদার ধারে, অনেক সাধু এবং বাবাজী আছেন, থাকিবার খুব

সুবিধা। আমরা একটি মঠে ছিলাম। চতুর্দিকে খুব পাহাড় এবং নির্জন স্থান, অতি চমৎকার দৃশ্যসকল আছে। কিছুদিন বেশি তথায় থাকিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রারব্ধ কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়। তাহার পর সেখান হইতে গোদাবরীর ধারে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীর বন দর্শন করি। তথায় ২।৩ দিবস থাকি। তথায় থাকিবার সুবিধাও বেশ আছে। তবে সেখানে সংসারী লোক অনেক বাস করে, স্থান তত নির্জন নয়। বনের নাম মাত্র নাই, তবে চতুর্দিকে ভারি ভারি পাহাড় আছে। তথা হইতে বোম্বাই যাই। বোম্বাই শহরে আমরা ৭।৮ দিন ছিলাম, কোনরূপ অসুবিধা আমরা বোধ করি নাই। একটি উত্তম বাটীতে ছিলাম। কালীপদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাসায় থাকিতে খুব অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আমরা ভাল স্থানে ছিলাম বলিয়া সেখানে থাকি নাই। বোম্বাই হইতে একটি শেঠ আমাদিগকে দ্বারকা যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট দেয়। জাহাজে ৪৭ ঘণ্টা প্রায় থাকিতে হয়; পরে দ্বারকাধামে পৌঁছাই। দ্বারকাধীশের মন্দির প্রায় সমুদ্রের সন্নিকট এবং মন্দির কম বড় নয়। সেখান হইতে ১৪ মাইল ভেটপুরী নামক স্থানে যাই। সেখানে খুব জাঁকজমক-আচারে মন্দিরের সেবাকার্য করিয়া থাকে। তথায় দর্শন করিয়া পুনরায় দ্বারকা আসিয়া জাহাজে চড়িয়া সুদামাপুরী নামক স্থানে আসি। তথা হইতে জুনাগড় নামক স্থানে যাই। সেখান হইতে গির্ণারের পাহাড় ৭ মাইল, তথায় ২।১ দিন থাকিয়া গির্ণারের পাহাড়ে যাই। গির্ণারের পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, খাড়া চড়াই ১০ মাইল। আমাদের উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, ৩।৪ দিবস গায়ের ব্যথা ছিল। তথা হইতে গুজরাটের ভিতর দিয়া আমেদাবাদ আসি এবং তথা হইতে পরে ৺পুষ্করতীর্থে আসি। ৺পুষ্কর-তীর্থে ৮।৯ দিন ছিলাম। তথায় একটি বাঙালী ব্রহ্মচারী আছেন।

তিনি আমাদের থাকিতে স্থান দেন—অতি ভদ্রলোক। তথায় আমাদের সঙ্গী লোকটির জ্বর হয়। ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা দুইজনে তাহাকে আজমীঢ় হাসপাতালে লইয়া আসি। তথাকার ডাক্তার বলিলেন, ইহার নিউমোনিয়া হইয়াছে। সেজন্য তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আমরা দুইজনে বৃন্দাবনধামে চলিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মচারী আমাদের এখানে আসিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বরাহনগরের সকলকার চরণে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। মাতাঠাকুরানী কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার সংখ্যাতীত প্রণাম জানাইবেন। যোগেন কোথায় এবং কেমন আছে, শরৎ প্রভৃতি হৃষীকেশে কেমন আছে, নরেন কেমন আছে এবং কোথায়, অনুগ্রহ করিয়া সত্বর পত্র লিখিবেন। আর আপনি আমাদের নমস্কার জানিবেন। সত্বর পত্রের জবাব দিবেন। ইতি—

নিঃ—শ্রীরাখাল

পয়সা-অভাবে বেয়ারিং পত্র দিলাম, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

৺বৃন্দাবন, ২৯ মার্চ, ১৮৯০

নমস্কার, নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

গতকাল আপনার এক পত্র পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। ইতিপূর্বে যে পোস্টকার্ডে আমাদের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ লিখিয়াছি, উহা বোধ হয় এতদিনে পাইয়াছেন। সুরেশবাবুর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে জানিয়া যৎপরোনাস্তি মনে কষ্ট পাইলাম। শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বর

সকলের রক্ষাকর্তা। তিনি এ যাত্রা যদ্যপি রক্ষা করেন তাহা হইলে মঙ্গল, নচেৎ সামান্য জীবের ইচ্ছায় কিছুই হইবার নহে।

তাঁহার লীলা কেহ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী হউক আর অজ্ঞানী হউক, সৎকর্ম করুক আর অসৎকর্ম করুক, সুখ-দুঃখ কর্মানুসারে সকলেরই ভোগ করিতে হয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ এবং শান্তিতে অবস্থান করে, এমত লোক অতি বিরল। বিশেষ ভাগ্যবান তিনিই, যিনি সকল বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন —বোধ করি শান্তিরাজ্যে তাহারই অধিকার। এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প, দুঃখের ভাগই অধিক এবং এই দুঃখময় জীবন লইয়া সকলেই দিন অতিবাহিত করিতেছে। জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়া কেন তাঁহার জীবকে এত কষ্টভোগ করান, ইহার গূঢ় ভাব তিনিই জানেন; সামান্য জীবের জানিবার কোন উপায় নাই। জীবের এত কষ্ট কেবল 'আমি' এবং 'আমার' এই অজ্ঞানবশতঃ। যাহার অহঙ্কার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে— মন, বুদ্ধি, প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন —আমার বলিতে কিছুই নাই, এমত ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী। জীবের নিজের কোন বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু সর্বদা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই—হে জগদীশ্বর, আমি কিছুই নই, এই চৈতন্যটুকু যেন থাকে এবং তুমি নিত্য এবং সত্য এই বোধ যেন সর্বদা থাকে। তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা, ভগবানের নিমিত্ত কটা লোকের সেরূপ ভালবাসা হয়? বোধ করি তাহার শতাংশের এক অংশ জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না, এবং কয়টা লোকই বা ভালবাসিতে চেষ্টা করে।

বাহ্যজগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্যজগতে মন থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহাই মনের স্বধর্ম। এই মনকে সর্ব-প্রকারে বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরিপাদপদ্মে স্থিত করা —ইহা কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। যত দিন যাইতেছে ততই অজ্ঞান এবং অশান্তিতে মনকে জড়ীভূত করিতেছে। সাধনভজন দ্বারা মনের শান্তি পাইব এরূপ আশাও নাই। যেমন পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রূপ অনুরাগবিহীন সাধন-ভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে। জানি না কতদিন আমাকে এরূপ অশান্তিতে এবং মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন সত্বর দেহাদিভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। এ জনমে আর কোন আশা নাই। এখন বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। আশীর্বাদ করুন যেন গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া যাই, আর আমার কোন বাসনা না থাকে।

নরেন এখন কোথায় সাধনভজন করিতে গিয়াছে? পূর্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, পওহারী বাবার উপর পূর্বে যেরূপ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হইয়াছিল এখন তাহা আর নাই। এবার লিখিয়াছেন যে, তাঁহার আদেশে অন্য কোন স্থানে তপস্যা করিতে গিয়াছে। তাহা হইলে বোধ হইতেছে, তাঁহার উপর এখনো খুব বিশ্বাস আছে। নচেৎ তাঁহার কথায় কেন সাধন করিতে যাইবে? নরেন কি এখন গাজীপুরে নাই? বাবুরাম যদ্যপি পীড়িত অবস্থায় গাজী-পুরে থাকে, তাহা হইলে আরোগ্য হইলেই যেন ফিরিয়া কলি-কাতায় যায়। তাহাকে ফিরিয়া যাইতে আপনি পত্র লিখিবেন। এক জায়গায় থাকিলে নানাস্থানে যাইতে মন বড় ব্যস্ত হয়, সেটা কেবল

ভ্রমমাত্র। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কথায়ও আমাদের চৈতন্য হয় না। ঠেকিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন, "যার হেথায় আছে তার সেখানেও আছে, যার এখানে নাই তার সেখানেও নাই।" বাস্তবিক এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি।

মাতাঠাকুরানী ৺গয়াধামে সত্বর যাইবেন লিখিয়াছেন এবং ৺গয়াধাম হইতে আসিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। নিরঞ্জনের অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা মাতাঠাকুরানীর উপর এবং আমাদের সকলেরই উচিত তাঁহার সেবা করা এবং তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, দেখা। আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার কোন সেবা করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ আমাদের উপর। মাতাঠাকুরানী গঙ্গাস্নান করেন এবং গঙ্গাতীরে থাকেন—এটা আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু নিরঞ্জন যেন তাঁহাকে লইয়া একটা গোলমাল না করে। কারণ, তিনি গোলমাল আদপে ভালবাসেন না। আমার অসংখ্য প্রণাম তাঁহার চরণে জানাইবেন এবং কহিবেন যেন আশীর্বাদ করেন তাঁহাদিগের চরণে আমার অচলা ভক্তি হয়।

এবার এখানে খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক জ্বর হইতেছে। ছোট বড় সকলকেই আক্রমণ করিতেছে। প্রায় সকলেই জ্বরে ভুগিতেছে। তবে ইহাতেই কেহ এখন মরিতেছে না। কিন্তু জ্বর এখন কমে নাই—এখনো অনেক লোকের হইতেছে। লোকাভাবে অনেক স্থানে মন্দিরের সেবাকার্য কমাইয়া করিতেছে। আপনাদের মন্দিরে লোকাভাবে বড় কষ্ট যাইতেছে। নূতন লোক আসিলে ২।৪ দিন কার্য করিয়া জ্বরে পড়িতেছে। এখন আর লোক পাওয়া যায় না—জ্বরগায়েই ঠাকুরসেবা করিতেছে বলিলে হয়।

গোসাঁইজী (শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) বড় ভাল নাই। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থাবস্থায় আছে, বোধ করি সত্বর তিনি স্বাস্থ্যলাভ

করিবেন। আমার শরীর এখনো বড় দুর্বল, স্নান সহ্য হয় না। খোকা বেশ ভাল আছে। সে হাঁটিয়া উত্তরাখণ্ডে যাইত, কিন্তু একটি বাবু বলিয়াছেন যে, তিনি জ্বর হইতে আরোগ্য হইলে তাঁহাতে এবং খোকাতে মিলিয়া হরিদ্বার যাইবেন। মালা শীঘ্র পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। যোগেনকে আমার কথা বলিবেন। আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, সেজন্য যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করে। বরাহনগরের সকলকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন, ইহাই নিবেদন। ইতি

নিঃ—শ্রীরাখাল

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

৺বৃন্দাবনধাম, ৬ আগস্ট, ১৮৯০

My dear—,

তোমার দুইখানি পোস্টকার্ড প্রাপ্ত হইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামীর আগ্রা হইতে রওনা হইবার পর আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। তিনি মধ্যে এলাহাবাদ এবং মির্জাপুর হইয়া পরে কাশীতে যাইবেন। কাশীতে পোঁছাইলে তোমাকে পত্র লিখিবেন, তজ্জন্য ব্যস্ত হইও না। সর্বদা সৎসঙ্গ করিবে। অসৎ-সঙ্গ মনের ভাব বিকৃত করিয়া ফেলে। পার্থিব সুখ বোধ হয় তুমি অনেক সম্ভোগ করিয়াছ এবং তাহার অনিত্যতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ—এখন সেসকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে ইহজীবনে এবং পর-কালে সেই নিত্যানন্দস্বরূপকে জানিতে পারিবে। সংসারে অনেক প্রলোভন, কিন্তু যে আন্তরিক কাতর হইয়া শ্রীশ্রীহরিপাদপদ্ম

স্মরণ এবং প্রার্থনা করে, সে অনায়াসে উহা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। একটি কথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, সত্বর এই কার্যটি করিবে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশ যাহা লেখা আছে, যত সত্বর পার নকল করিয়া পাঠাইয়া দিবে। তুমি কেমন থাক মধ্যে মধ্যে লিখিবে। ইতি

Brahmananda

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বেলুড় মঠ, ১৪ মে, ১৮৯৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু মধ্যে আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং নানা কার্যে ব্যস্ত থাকার দরুন তোমাকে সময়মত জবাব দিতে পারি নাই। আশা করি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবে। আমাদের স্বামীজী দার্জিলিং হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। ৮।১০ দিন থাকিয়া পরে গত বুধবার দিবস নৈনিতাল যাত্রা করিয়াছেন। সেখানকার লোক তাঁহাকে invite (নিমন্ত্রণ) করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তথা হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিবেন। সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ, সদানন্দ এবং স্বরূপানন্দ ও চারিজন মেম গিয়াছেন। উক্ত মেমদিগকে বোধ হয় তুমি দেখিয়া থাকিবে—Mrs. Bull, Miss Macleod, Miss Nobel এবং Mrs. Patterson, শেষের মেমটি কলিকাতায় থাকেন, ইঁহার স্বামী কলিকাতায় Consul-General, U. S. A. স্বামী নিত্যানন্দ ওখানে আছেন এবং ভাল আছেন শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। মাসিক পত্রিকার এখনো prospectus (নিয়মাবলী) বাহির হয় নাই; বাহির হইলে তোমার কাছে কতকগুলি

পাঠাইয়া দিব। আজকাল কলিকাতায় প্লেগের বড় panic (আতঙ্ক) হইয়াছে। অনেক লোক শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। প্রধান প্রধান ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে প্লেগ নয়। এখনো ঠিক জানা যাইতেছে না। স্বামীজী আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে যদ্যপি কলিকাতায় যথার্থই প্লেগ হয়, তাহা হইলে hospital (হাসপাতাল) এবং segregation house (আলাদা বাড়ি) করিয়া ভদ্র এবং দরিদ্রগণকে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে। কলিকাতায় স্থান দেখা যাইতেছে। আশা করি, তুমি ভাল আছ। শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে সর্বদা স্মরণ-মনন রাখিবে, তাহা হইলে সকল মলিনতা দূর হইয়া যাইবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আলাহিদা একটি ঘরে ধূপধুনা দিয়া তথায় একটি আসনে বসিয়া যতক্ষণ পার নিয়মিতরূপে ধ্যান-জপ ইত্যাদি করিবে। এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে যতটুকু ঈশ্বর-উপাসনায় অতিবাহিত করিতে পারে, তাহাতেই তাহার জীবন সার্থক হইবে—অনিত্য পদার্থে যাহার যত আসক্তি তাহার ততই অশান্তি। প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় তোমার মতি যেন ধর্ম-পথে থাকে।

যদ্যপি কলিকাতায় ঈশ্বরের কৃপায় প্লেগ না হয়, তাহা হইলে আগামী শীতকালে সারদানন্দ স্বামী ও আমি ঢাকা অঞ্চলে যাইব, এরূপ ইচ্ছা আছে। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামীকে আমাদের নমস্কারাদি জানাইবে। ইতি।

With love and good wishes,
Yours sincerely,
Brahmananda

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বেলুড় মঠ, ১৮ জুন, ১৮৯৮

My dear—,

আশা করি তুমি ভাল আছ। কিছুদিন পূর্বে তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা পাইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত স্বামী নিত্যানন্দ এখন কেমন ও কোথায় আছেন সবিশেষ লিখিবে।

স্বামীজী মহারাজ এখন আলমোড়া হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছেন। অন্যান্য সাধুগণ আলমোড়ায় আছেন। কেবল দুইজন শ্রীশ্রীকৈলাসপর্বত দেখিতে গিয়াছেন। নূতন মঠে থাকিবার মতো পাঁচ-ছয়টি ঘর প্রস্তুত হইবার জন্য কন্ট্রাকটারকে চুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনমাসে প্রস্তুত হইয়া যাইবে। আগামী আশ্বিন মাসে মঠ সেখানে উঠিয়া যাইতে পারে।

তোমার এখন মনের অবস্থা কেমন? ঈশ্বর-উপাসনা ব্যতীত মনের শান্তি হয় না। নিত্য সহস্র কাজ পরিত্যাগপূর্বক কিছু কিছু সময় ধ্যানজপ কীর্তন ইত্যাদি করিবে। ঠিক ঠিক ভক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞান অনেক সাধনার ফলে হয়। এ সংসারে অনেকে দিন কতক অল্প অল্প ভজন করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ বা আনন্দ অনুভব না করিয়া একেবারে নাস্তিকের মতো হইয়া পড়ে। তাহার কারণ, তাহাদের ঠিক ঠিক অনুরাগ হয় নাই। অনুরাগ না হইলে ভজন-সাধন হয় না এবং ধৈর্য ধরিতে পারে না। অনুরাগবিহীন জনের মন ও চিত্ত সর্বদা শুষ্ক ও অশান্তিময় হইয়া থাকে। মানুষ যত ভগবৎ-উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করিতে পারে, পরিণামে সে নিশ্চয় ততোধিক শান্তিলাভ করে। ঠাকুর সর্বদা বলিতেন—"হরিসে লাগি রহো রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই।" খুব লেগে থাক—"মন, কররে পণ প্রাণাধিক।"

কলিকাতায় প্লেগের আন্দোলন খুব চলিতেছে। শুনিতেছি, ২।৪ জনের মৃত্যু নিত্য হইতেছে। কেহ বলে, একটু সন্দেহ হইলেই হাসপাতালে যাইতেছে। যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় না হইলেই মঙ্গল ; নচেৎ বাঙলাদেশ ছারখারে যাইবে। চাকর ইত্যাদির জন্য লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে, বলা যায় না। আমাদের ইচ্ছা যে, শীতের প্রারম্ভে আমি এবং শরৎ মহারাজ ঢাকা বেড়াইয়া আসি। তাহার পূর্বে তোমাকে লিখিব। উপস্থিত তোমাদের ওখানে কেমন climate (স্বাস্থ্য) লিখিবে। শ্রীযুক্ত নাগ-মহাশয় কেমন আছেন ? তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে।··· আমার শরীর একটু খারাপ যাইতেছে—আমার আমাশয় হইয়াছে। আশা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি

With love and blessings,
Yours sincerely,
Brahmananda

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বেলুড় মঠ, ৬ জুলাই, ১৮৯৮

My dear—,

তোমার দুইখানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আলমোড়া হইতে সদানন্দ স্বামী এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কার্যের দরুন আমাকে কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। সেইজন্য তোমাকে যথাসময়ে জবাব দিতে পারি নাই। আলমোড়া হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' বাহির হইবে। ১ আগস্ট হইতে নিয়মিতভাবে বাহির হইবে। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর প্রবন্ধ তাহাতে থাকিবে। তুমি তাহার একটা গ্রাহক হইবে এবং পড়িবে। তাহাতে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ থাকিবে।

তুমি নিয়মিতরূপে সাধনভজন করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দুই বৎসর এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস করিলে পরিণামে ফল বুঝিতে পারিবে। তোমার শরীর খারাপ, বেশিক্ষণ বসিবার প্রয়োজন করে না। প্রথমে ধীরে ধীরে অভ্যাস করা খুব ভাল। আজ আমি ব্যস্ত আছি, সেইজন্য বেশি লিখিতে পারিলাম না।···

স্বামীজীর ঢাকা যাওয়া সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই, তবে শীতকালে এখানে আসিলে যাইতে পারেন। তিনি নিজে সদাশিব, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। তোমরা আগ্রহ প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই যাইবেন। আমাদের বিশেষ যাওয়ার ইচ্ছা আছে। সময়ে তোমাকে লিখিব। এখানে কয়েক দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের নূতন মঠে আপাততঃ থাকিবার মতো গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। দুই-তিন মাসে শেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আশা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি

With love and good wishes,
Yours sincerely,
Brahmananda

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

বেলুড় মঠ, ২২ মে, ১৯০৩

My dear—,

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত ও বিস্তারিত অবগত হইলাম। তুমি এখন শারীরিক ভাল আছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। পার্শেলে যে মালা পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়াছি জানিবে। মালাগুলি অতি সুন্দর। আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে। কিন্তু গাঁথিতে গিয়া দেখা গেল যে বড়ই ছোট হইয়াছে। জপ করিবার

একটু অসুবিধা হয়। যদ্যপি তুমি আর অতগুলি মালা সত্বর পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। আমি আষাঢ়ের প্রারম্ভে ৺কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে যাইব। তিন-চার মাস তীর্থাদি দর্শন ও সাধনভজনে অতিবাহিত করিব, এইরূপ নিশ্চয় মানস করা গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

বৈরাগ্য না আসিলে ঠিক ভগবানের ভাব ধারণা করিতে পারা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁর যত বৈরাগ্য তিনি তত ভিতরের শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বিবেক ও বৈরাগ্যের মূর্তি ছিলেন। যত দিন যাইতেছে ততই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিতেছি। বিবেক-বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে তাহা জ্বলন্ত দেখিয়াছি। আমাদের দুরদৃষ্ট যে, এমন জিনিস দেখিয়া শুনিয়াও নিজ জীবনে প্রতি-ফলিত করিতে পারিলাম না। মঠে একটা ইন্দারা (পাতকুয়া) খোদা হইতেছে, সেইজন্য বড়ই ব্যস্ত আছি। মধ্যে মধ্যে কেমন থাক লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি

With love and good wishes,
Yours sincerely,
Brahmananda

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীশ্রীরথযাত্রা

ভদ্রক, উড়িষ্যা, ১৪ জুলাই, ১৯১৫

প্রিয়—,

মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্যাদি করিয়া আমাদের সব ভুলিয়া গিয়াছ। এখন দেখিতেছি তা নয়, আমাদের একটু একটু মনে আছে। যাহা হউক, তপস্যার জন্য কাশী যাইতেছ, তা যাও। আমাদেরও একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমাদেরও

সেখানে যাওয়া হয়। আহা, এমন স্থান! কাহার না সাধ হয় সেখানে গিয়া বাস করিতে। আমি যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি—যাও, কাশী গিয়া তপস্যা কর। কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার স্থান। আমার যখনই কাশীর কথা মনে পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তে সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া তথায় যাই।...শেষ জীবনটা ৺কাশীবাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার প্রবল ইচ্ছা। ৺কাশীর কথা মনে পড়িলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশি আর কি বলিব, একান্তে স্থির হইয়া বসিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই কাশীবাসের চরম ফল। ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

Yours affectionately,
Brahmananda

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

ভদ্রক, উড়িষ্যা, ১৯১৫

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তোমার সাধন-ভজনের ইচ্ছা হইয়াছে ও অনুকূল স্থান মিলিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। সকলই তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে। সকল বিষয়ে যখন সুবিধা হইয়াছে তখন সময়ের সদ্ব্যবহার কর। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। বড় বড় প্রশ্নে মাথা না ঘামাইয়া কিছু কাজ কর। খাটিলেই বস্তু পাওয়া যায়—ইহা বিশ্বাস করিয়া কাজে লাগিয়া যাও। না খাটিয়া কেবল বড় বড় প্রশ্ন করিয়া জীবন কাটাইলে কোন ফল হইবে না। সকল সুবিধা যখন হইয়াছে তখন কিছুদিন সাধনভজনে ডুবিয়া থাক—অন্ততঃ এক বৎসর। দেহ মন শুদ্ধ হইবে, তাঁর কৃপা ধারণা হইবে।

বাজে কাজে, বাজে চিন্তায় মন না দিয়া কিছুদিন তাঁকে নিয়া থাক, ইহাই আমার ইচ্ছা। ধ্যানজপ, স্মরণমনন সর্বদা করিবে। লোক জুটিয়ে আড্ডা বা অপরকে উপদেশ দিবে না। —র মতো তপস্যা করিলে চলিবে না। শরীর এখনো পটু আছে, মনে এখনো বিষয়ের কোনরূপ ছাপ পড়ে নাই—এই বেলা কাজ গুছাইয়া লও। এখন মনকে তৈয়ারি করিতে না পারিলে পরে কিছু করা শক্ত হইবে। উপদেশ ও আড্ডা দিবার যথেষ্ট সময় পাইবে—সারাজীবন। এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। আকুল প্রাণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবেন। নিম্নে তোমার প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিলাম। এইভাবে কিছুদিন চলিতে পারিলে যথেষ্ট কল্যাণ হইবে।

প্রশ্ন—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত সময় ধ্যানজপ করা উচিত এবং কত সময় পূজাপাঠে দেওয়া উচিত ?

উত্তর—ধ্যানজপে ও পূজাপাঠে যত বেশি সময় দিতে পারা যায় ততই কল্যাণ। যাহারা শুধু সাধনভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্ততঃ ১৫।১৬ ঘণ্টা ধ্যানজপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, তত বেশি আনন্দ পাইবে। ভজনে একবার আনন্দ পাইলে কোনমতেই আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ২/৩ ভাগ সময় যাহাতে ধ্যানজপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। বাকি সময়ে সৎ গ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যানজপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখকান বুজিয়া ঘণ্টাখানেক ধ্যানজপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে

চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যেসব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিয়া মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যানজপ হইবে। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই জপধ্যান করা। ধ্যানজপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। ধ্যানজপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যানজপ ঠিক ঠিক হইতেছে না। আর একটি কথায় বিশেষ খেয়াল রাখিবে যে, যিনি তোমার আহারাদি যোগাইতেছেন তিনি তোমার শুভকর্মের ফল কিছু পাইবেন। সঞ্চয় এমন হওয়া চাই যে, খরচ হইয়াও নিজের জন্য যেন কিছু থাকে।

প্রশ্ন—মন অনেক সময় ধ্যানজপ করিতে চায় না, তখন ধ্যানজপ ছাড়িয়া দিয়া পাঠাদি করা উচিত বা জোর করিয়া ধ্যানজপ করা উচিত?

উত্তর—মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য জোর করিয়া ধ্যানজপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতস্থ করিয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বশে আনাই সাধনপথের লক্ষ্য।

প্রশ্ন—প্রাণায়াম, আসনাদি হঠযোগের ক্রিয়া অল্প-বিস্তর করা বিশেষ আবশ্যক কি না?

উত্তর—এখন এইসব করিবার দরকার নাই। তাঁহার নাম কর, প্রার্থনা কর, স্মরণমনন কর। তিনিই তোমার যাহা দরকার করাইয়া লইবেন, বিশ্বাস কর।

প্রশ্ন—পূজা-পাঠে কত সময়, ধ্যান-জপে কত সময় দেওয়া উচিত ? নিদ্রা কতটা দরকার ?

উত্তর—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ তিন ভাগের দুই ভাগ সময় ধ্যান-জপে এবং বাকি এক ভাগ পূজা-পাঠ, চিন্তা, নিত্য-কর্ম ও বিশ্রামের জন্য রাখা ভাল। সুস্থ শরীরে চার ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। কাহারও দুই-এক ঘণ্টা ঘুম বেশি দরকার হয়। পাঁচ ঘন্টার বেশি ঘুম রোগবিশেষ। বেশি ঘুমাইলে শরীরের বিশ্রাম হয় না, খারাপ হয়, অনিষ্ট করে। সাধকের ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। প্রথম বয়সে মন গড়িয়া লও, ঘুমাইবার সময় পরে যথেষ্ট পাইবে। কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে প্রথমেই শরীরে সইবে না, বিশ্রাম চাই, ইত্যাদি নানা কথা বলে। খাটিবার নাম নাই, বিশ্রাম! যে ঠিক ঠিক ধ্যান-জপ করে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন regular (নিয়মিত) ভাবে চলে যে, তার পক্ষে চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোক irregular (অনিয়মিত) ভাবে চলিয়া শরীর ও মনকে এত tired (ক্লান্ত) করিয়া ফেলে যে, আট-দশ ঘণ্টা ঘুমাইলেও তাদের বিশ্রাম হয় না। জীবনকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা কর। ঘড়ির মতো চলিবে। তাতে শরীর-মন খুব ভাল থাকিবে। কর কিছু। খালি প্রশ্ন করিলে কি হইবে। কাজে লাগিয়া যাও—দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পাইবে।

প্রশ্ন—আহার সম্বন্ধে কি করা উচিত ? যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই খাইব অথবা খাওয়া সম্বন্ধে কোন রকম বাছবিচার করিব ?

উত্তর—সাধনভজনের সময় যদি সম্ভব হয় একটু-আধটু বাছ-বিচার করিয়া খাওয়া ভাল। কতকগুলি জিনিস খাইলে ঘুম প্রভৃতি বেজায় বাড়িয়া যায়, সেগুলি না খাওয়াই ভাল। বেশি মিষ্টি, টক, কলায়ের ডাল বা কলায়ের ডালের তৈরি খাবার না খাওয়াই ভাল।

এইসব জিনিস খাইলে তমোগুণ বাড়াইয়া দেয়—সর্বদা ঘুম পায়। ঘুমাইবে, না ধ্যান-জপ করিবে? যাহা সহজে হজম হয় সেইসব খাবার তিন ভাগের দুই ভাগ পেট ভর্তি করিয়া খাইলে, শরীরে strength (শক্তি) বাড়ে। একগাদা খাইলে হজম করিতেই সব energy (শক্তি) বাহির হইয়া যায়—পেটে বায়ু হয়। তিন ভাগের এক ভাগ পেট খালি থাকিলে ঐরূপ হয় না। সুস্থ শরীর ভজনের সহায়।

সাধনভজনে মন বেশ জমিয়া গেলে বসিয়া খাওয়া চলে। সাধনভজনের সময় দুই-এক ঘন্টা বাজে কাজে যাহারা নষ্ট করে, তাহাদের মাধুকরী করিয়া খাওয়া ভাল। মাধুকরীর অন্ন শুদ্ধ অন্ন—দোষ লাগে না। বসিয়া খাইলে দাতাকে ভজনের কতক অংশ দিতে হয়, সেই হিসাবে মাধুকরী করা ভাল।

প্রশ্ন—সাধনভজনের সময় মৌন থাকা ভাল কি না? কোন কাজের জন্য যদি কথা কহিবার আবশ্যক হয় বা মৌন থাকার জন্য মন চঞ্চল হয়, সে অবস্থায় কি করা উচিত?

উত্তর—মৌন থাকাও ভাল নয়, আবার বেশি কথা বলাও ভাল নয়। বাহিরে মৌন না হইয়া ভিতরে মৌন হওয়াই ভাল। যতটা দরকার তাহার বেশি কথাবার্তা না কহিলে মৌন থাকিবার কাজ হইয়া যায়। জোর করিয়া মৌন থাকিবার অনেক দোষ।

প্রশ্ন—কাপড়-চোপড় কতটা রাখা ভাল? কতটা শীত ও তাপ সহ্য করা উচিত?

উত্তর—কাপড়-চোপড় কিছু রাখা দরকার। বাঙালীর শরীরে বেশি কঠোরতা চলে না, আবার বুচকি বাঁধিবার মতো জিনিস সংগ্রহ করাও ভাল নয়। যতটা একান্ত দরকার, ততটা লইবে। বেশি লওয়া খুবই অন্যায়। আপনা থেকে আসিলেও লওয়া

উচিত নয়। ভগবান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য, কঠোরতা করা নয়। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যতটুকু কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা দরকার করিবে। তার চেয়ে বেশি জিনিস রাখা ও ব্যবহার করা বাবুয়ানি। সাধুর পক্ষে বাবুয়ানি করা খুব খারাপ। বিলাসিতার জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করা অত্যন্ত খারাপ।

প্রশ্ন—আমার নিজের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আশীর্বাদ করুন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও আপনার উপর বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয়, আপনাদের কৃপা বুঝিবার ও ধারণা করিবার যেন সামর্থ্য হয়।

উত্তর—নিজের উপর অবিশ্বাস আনিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরই সব সুবিধা করিয়া দিবেন। ঐ যে ভদ্রলোকটি তোমাকে সাহায্য করিতেছেন, ইহা তাঁহারই ইচ্ছা জানিবে। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর। তাঁহার নাম করিয়া যাও, তিনিই সব বুঝাইয়া দিবেন। চঞ্চল হইও না। পড়িয়া থাক, নাম কর, খাট। খাটিয়া যাও, বস্তু পাইবে। বাজে চিন্তায় ও বড় বড় প্রশ্নে সময় নষ্ট করিও না। খুব সুন্দর সুযোগ হইয়াছে, হেলায় হারাইও না। ভগবানের কৃপা সকলের উপর রহিয়াছে—একটু খাটিলেই, চোখ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে আসিয়াছ, ইঁহাদের কৃপা পাইয়াছ; ইঁহারা যেমনটি বলেন, সেইটি জীবনে ফলাইবার চেষ্টা কর। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

প্রশ্ন প্রায় সকল বিষয়ে করিয়াছ, উত্তরও প্রায় সবগুলিই দিলাম। এখন জীবনে ফলাইবার চেষ্টা কর। যে ভদ্রলোকটি তোমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে আমার শুভেচ্ছা দিবে। তোমার পত্রে বুঝিলাম, লোকটি প্রকৃতই ভক্ত। সদ্ব্যয় করিবার ইচ্ছা কয়টা লোকের হয়—বিশেষতঃ বড়লোকের ? তিনি তোমার জন্য এত করিতেছেন, তাঁহার অর্থব্যয় যেন বৃথা না হয়।

তুমি এমনভাবে থাকিবে, তোমার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অর্থের সদ্ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি যেন দিন দিন বৃদ্ধি হয়। তোমার ভাল মন্দ কর্মের ভোগ তাঁহাকেও কিছু করিতে হইবে। এমন কোন কর্ম করিয়া আসিও না, পরে যাহাতে উঁহাকে ভুগিতে হয়। সাবধান, মানযশের কাঙাল হইও না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করিবে, মানযশের ইচ্ছা কখনো মনে যেন না আসে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন, সদ্বুদ্ধি দিন, মানুষ করুন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপাদপদ্মভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ
আগস্ট, ১৯১৮

কল্যাণীয়া—,

তোমার পত্র পাইলাম। ...এমন করিয়া মন ঠিক কর যাহাতে মনের অগোচর কিছু না থাকে, অর্থাৎ সেই অন্তর্যামী মহান পুরুষের চিন্তা করিয়া মন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতে লয় করিয়া দাও। —তাহা হইলে মন মহাশক্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন মনের অগোচর আর কিছুই থাকিবে না। সেই মহান পুরুষের দুইটি ভাব লইয়া জগৎ বিকশিত—নিত্য ও লীলা! তিনি কখনো নিত্যতে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কখনো লীলায় পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্ভোগ করিতে থাকেন। এ কথাটি পড়, শোন, ভাব। "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।"

"দরশন দাও হে কাতরে, দীনহীন আমি,
রোগে কাতর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে।"

সংসারে থাকিতে গেলে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়। এই সংসারের এইরূপই ধারা। তবে যিনি সেই পরমপদ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই কেবল বীরের মতো সহ্য করিয়া যান।

কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি।

মহাজনেরা হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সংসারে জীবনযাপন করেন। হিমালয়ের শৃঙ্গে কত ঝড়, কত বৃষ্টি, কত ঝঞ্ঝাবাত, কত বজ্রপাত হয়, কিন্তু সে ঐসকল অচলভাবে তাহার মস্তকে ধারণ ও সহ্য করিয়া থাকে।

কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।

ভাবের তরঙ্গ দূরকে নিকটে বাঁধিয়া রাখে। উহা অনেক সময় ভাবরাজ্য দিয়া মনকে দুঃখ ও সুখের মধ্য দিয়া লইয়া যায়। ভাব না আসিলে স্বার্থকে তাড়াইতে পারে না। ভাবের দ্বারাই নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রাপ্ত হয়—"যেমনি ভাব তেমনি লাভ।"

"নদ নদী সাত সমুদ্র সব ভরপুর।
তুলসী চাতককা এক বিন্দু বিনা সব দূর ॥"

ভাব বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ না তাঁর কাছে পোঁছান যায়, ততক্ষণ সব আলুনী।

"কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ মলিনতা তায় হে।
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেমমুখচাঁদ উদয় নাহি হয় হে ॥"

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেবভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, পুরী
৩ ডিসেম্বর, ১৯২১

কল্যাণীয়া—,

আজ তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি পরীক্ষা দিবে কি না দিবে, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছ। তোমার যদি পরীক্ষা দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকে, দিতে পার। নচেৎ তুমি তো স্ত্রীলোক, পরীক্ষা দিয়াই বা তোমার কি লাভ হইবে? বাটীতে ভাল করিয়া মনোযোগ দিয়া পড়িয়া লও, যাহাতে গীতা, ভাগবতাদির মূলগুলি ভাল করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পার। ঠাকুর বলিতেন, "পাশবদ্ধ জীব, আর পাশমুক্ত শিব।" তাই এই সকল পাশ দিয়া প্রায়ই সকলের পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া জোটে ও ভগবানকে তাহারা ভুলিয়া যায়। তুমি নিজের পাঠ্যপুস্তকগুলি বুঝিতে যতটুকু সংস্কৃত শিক্ষা করা প্রয়োজন, সেইরকম শিক্ষা কর। পাশ দিয়া কি হইবে? যাহাতে সংসারে থাকিয়া নিত্য শ্রীভগবানের স্মরণমনন, সাধনভজন করিতে পার, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। কথায় বলে, যে দিন ভগবানের ভজন না করা যায়, সেই দিনই বৃথা। তাই তুমি তাঁহার সাধনভজনে অধিকতর মন দিবার চেষ্টা কর—যাহাতে নিত্য তাহা করিতে পার।

আমার শীঘ্রই কলিকাতা যাইবার কথা আছে। সেখানে কয়েক দিন থাকিব, কারণ, বহুদিন পরে ভক্তদের তথায় দেখিতে পাইব। তথায় যাইলে তুমি আমায় পত্র দিও, পরে যে প্রকার ব্যবস্থা হয় তোমায় জানাইব। আমার শুভাশীর্বাদ জানিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

নির্দেশিকা